গণতন্ত্র

July, 2022 রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক পত্রিকা Vol –III Issue –I, 2022

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরঃ একটি মূল্যায়ন

❶ ৭৫ বছরে ভারতের বিদেশেনীতির মূল্যায়ন

❷ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের দলীয় রাজনীতি বিবর্তন: একটি মূল্যায়ন

❺ ৭৫ বছরে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

❻ ভারতীয় ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন এবং বাস্তবতা

নিয়মিত বিভাগ

➊ শ্রদ্ধা ➋ সাম্প্রতিক ইস্যু ➌ ক্যুইজ বিভাগ

➍ বিভাগের অন্দরমহল ➎ পুস্তক পর্যালোচনা

মুখ্য উপদেষ্টাঃ শ্রীকৌস্তভ ভট্টাচার্য্য, ভার-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

উপদেষ্টা মন্ডলীঃ পরিচলন সমিতির মাননীয়া সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যা এবং একাদেমিক সাব কমিটির সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

সম্পাদকঃ শ্রীপ্রসেনজিৎ সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সহযোগী সম্পাদক মন্ডলীঃ সফিউল ইসলাম খান, সহকারী অধ্যাপক। শ্রী স্বপন কুমার বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক। মৃণাল সিংহ বাবু, স্টেট এডেড কলেজ টিচার। রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পত্রিকাস্বত্বঃ করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ প্রকাশকাল : ১৫ই আগস্ট, ২০২২

তৃতীয় ভলিউম, প্রথম ইস্যু।

পত্রিকায় উল্লিখিত বা লিখিত মন্তব্য লেখকের নিজের, প্রতিষ্ঠান বা সম্পাদকের নয়।

প্রকাশক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ।

মতামত বা অভিযোগ বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে যেকোনো মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
politicalscience@karimpurpannadevicollege.ac.in

Website Link : https://karimpurpannadevicollege.ac.in/emagazine/

@ পত্রিকা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ব্যতীত পত্রিকার যে কোন অংশের অনুলিপি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

মুদ্রণ ও ডি টি পি : শ্রী জয়ন্ত দত্ত, নবদ্বীপ ।

বিষয় সূচীঃ

সম্পাদকের কলমেঃ-

কেবল মূল্যবোধেরই 'উন্নয়ন' হলো না!

শ্রদ্ধা

১। ২৫০ বছরে রাজা রামমোহন রায়: প্রাসঙ্গিকতার বিচারে ফিরে দেখা- • আসমিনা খাতুন

২। জীবনপুরের পথিক তরুণ মজুমদারঃ (৮ই জানুয়ারি ১৯৩১ - ৪ঠা জুলাই ২০২২):- বাংলা চলচ্চিত্র জগতের একজন বিস্ময়কর স্রষ্টা • অনন্যা পাল

সাম্প্রতিক ইস্যু

১। AFSPA: স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরে সমস্যা না সমাধান • যুক্তালেখা রায়

২। মরার উপর খারার ঘা: সংকটে শ্রীলংকা • রিঙ্কি বিশ্বাস

৩। পাকিস্তান সমস্যা • রুবিনা খাতুন

৪। ভারতে ১৬ তম রাষ্টপতি নির্বাচন ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য • সৌরভ স্বর্ণকার

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

১। ৭৫ বছরে ভারতের বিদেশেনীতির মূল্যায়ন • বর্ষা খাতুন

২। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের দলীয় রাজনীতি বিবর্তন: একটি মূল্যায়ন • মৃণাল সিংহ বাবু

৩। ৭৫ বছরে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান • সঞ্জু মন্ডল

৪। ভারতীয় ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন এবং বাস্তবতা • অসম রেজা

ক্যুইজ বিভাগ

• সৌরভ স্বর্ণকার

বিভাগের অন্দরমহল

পুস্তক পর্যালোচনা

স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ: আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা সম্ভাবনা

সম্পাদক- আশিস নিয়োগী

ক্যুইজের উত্তর

করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

সম্পাদকীয়

কেবল মূল্যবোধেরই 'উন্নয়ন' হলো না!

৭৫ বছরে মানুষ পৌঢ়ত্ব লাভ করলেও উপনিবেশিক শৃঙ্খলা মুক্ত নাগরিকদের পক্ষে এ এক অনন্যানুভূতি। বলা যেতে পারে একটি স্বাধীন দেশের পক্ষে ৭৫ বছর কিছুই না। এবছর এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমরা তিন ধরনের মানুষকে এর সাক্ষী হিসেবে পাবো যারা - একদল যারা পরাধীনতা দেখেছে আবার স্বাধীনতার এই ৭৫ বছরও দেখছে, যারা ২৫,৫০ ও ৭৫ তিনটেই দেখেছে। আর আমরা যারা ৫০ দেখেছি ৭৫ ও দেখছি। এই তিন প্রজন্মের মানুষই সকলেই তাদের আলোচনায় এই উদযাপনের প্রাক্কালে কি ছিল আর কি হলো এই ব্যালেন্স শিট করতে তুল্যমূল্য যুক্তির প্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান দিয়ে বিতর্ক করছে। সাফল্যের দিক হিসাবে কেউ কেউ বলছেন, পরাধীন ভারতবর্ষে তথা ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল ৯০%। যা এখন ২৬ শতাংশ। সাক্ষরতার হার ছিল ১৬%, এখন সেটি ৮২ শতাংশ। আবার গড় আয়ু ছিল ২৭ শতাংশ যা এখন ৭০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাতৃত্ব বা শিশু মৃত্যুর হারও অনেকটা কমেছে। ৯৬ শতাংশ পরিবারের কাছে পানীয় জল পৌঁছেছে, ৯৭% মানুষ পরিবার বৈদ্যুতিক সংযোগ পেয়েছে। ৭৯ শতাংশ নারীর বর্তমানে নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে এবং ৫৪ শতাংশ মহিলা ফোন ব্যবহার করছে । এগুলো অবশ্যই সাফল্যের দিক।

আবার অন্যদিকে হতাশা বা অসন্তোষের বিষয়গুলি হল ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ মানুষ এখনো অপুষ্টিতে ভোগে, ক্ষুধার নিরিখে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান শেষের দিক থেকে গণ্য হয় (১১৬ টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১, ২০২২ এর সমীক্ষার নিরিখে) ।পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের কুড়ি শতাংশের ওজন বয়সের তুলনায় কম, ওই একই বয়সের ৩৪.৭ শতাংশ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়, ৫১ শতাংশ মহিলা এখনো রক্তাল্পতায় ভোগে। এরূপ আরো অনেক পরিসংখ্যান দেওয়া যেতেই পারে।

আসলে সচেতন মানুষ মাত্রই একথা স্বীকার করবেন যে বাহ্যিক বিষয়ে দেশের উন্নতি পর্যাপ্ত হলেও ভারতীয় নাগরিকদের মূল্যবোধ, রাজনৈতিক স্বার্থ মুক্ত দেশপ্রেম, সামাজিক কর্তব্যের উন্নতিতো হয়নি বরং বিকৃত এক সামাজিকীকরণের ফলে এটি ব্যস্তানুপাতিক হারে নিচে নেমেছে। যে

বিষয়গুলো থেকে মূল্যবোধ বিযুক্ত হয়েছে সেটারই অধোগতি বা মানুষের কাছে তা ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছে। রাজনীতি বলুন, শিক্ষা বলুন সরকারি অন্যান্য কর্মক্ষেত্র বলুন। সর্বস্তরেই মূল্যবোধ ম্রিয়মান হয়েছে। স্ট্যান্ডার্ড অফ ভ্যালুস কমলে তার ক্ষতি সুদূরপ্রসারী। ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ এ যে গতিতে দেশের জাতীয় নেতৃত্ব বা সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগ, দেশগঠন বা অন্যান্য কাজে উৎকর্ষ মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, পরবর্তী ৫০ বছরে তার অধগতি দেখলে শিউরে উঠতে হয়। এখনো দেশের বেশিরভাগ মানুষ সরকারি সাহায্য প্রয়োজন না থাকলেও নিতে দ্বিধাবোধ করেন না। আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ দেশের সম্পদ এবং সম্পত্তিরক্ষার প্রতি একটা দায় সারাভাব। নিজেকে গরিব বলে প্রমাণ করতে পারলে, আর কিছু সরকারি সাহায্য নিতে পারলেই আমাদের যথার্থ নাগরিক হয়ে ওঠা হয়। আত্মনির্ভর ভারত তৈরি করতে গেলে আগে আত্মনির্ভর ভারতীয় তৈরি করতে হবে। যে নাগরিক অপ্রয়োজনে এই দেশের সম্পদের অপচয় করবে না, যে বলবে আমার সামর্থে আমি বিশ্বাস রাখি অযথা সরকারি সাহায্য নেব না। আর রাজনীতিবিদদের থেকেও এই অহেতুক সাহায্য প্রদান করে সাধারণ মানুষকে পরনির্ভর করে তোলার রাষ্ট্রমুখী করে তোলার নেশা ছাড়তে হবে। দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ সামাজিক মূল্যবোধ সবই যেন ব্রিটিশ বিতরণের পর আমরা ফেলে দিয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবেন এমন মানুষ কোথায়? আসলে তিনি মূল্যবোধযুক্ত মানুষের কথা বলেছেন । সুতরাং বুঝতে অসুবিধা নেই এই মূল্যবোধযুক্ত মানুষের অভাবের কারণেই ঠিক যেমনটা আমরা ভাবি দেশের অবস্থা ঠিক তেমনটা নয়। কিভাবে এই মূল্যবোধের বিস্তার বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে আনা যায় তারই মূল আলোচনা হওয়া দরকার এই পচাত্তর বছরের স্বাধীনতা উদযাপনের দিন। সংকল্প নিতে হবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করাতে হবে এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের যারা দেশের ভবিষ্যতের সম্পদ। আর কিভাবে এই মূল্যবোধের অবগতি হলো তারও একটা সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রয়োজন। স্বাধীনতার ৫০বছরে যে সমস্ত বই পত্র লিখিত হয়েছিল সেখানে যা যা সমস্যা ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল এই মূল্যবোধের সমস্যা। আজ ৭৫ বছরে এসে দাঁড়িয়েও এই একই বিষয়ের সমস্যা আরো কঠিন হয়েছে। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি বাকি 'উন্নয়ন' গুলো এখন বন্ধ থাক। সকলেরই লক্ষ্য হোক মানবিকতার উন্নয়ন।

শ্রদ্ধা

২৫০ বছরে রাজা রামমোহন রায়: প্রাসঙ্গিকতার বিচারে ফিরে দেখা-

আসমিনা খাতুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার সান্মানিক করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

তরুণ বঙ্গ ও নবীন ভারতের আধুনিক চিন্তা জগতে অগ্রহায়নের ভূমিকা নিয়ে রামমোহনের আবির্ভাব এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের বাইশে মে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার রাধানগর গ্রামে এক জমিদার পরিবারের রামমোহনের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন রামকান্ত রায়(বৈষ্ণব), মাতা ছিলেন তারিনী দেবী (শাক্ত)।

আধুনিক ভারতের নবজীবনের সূচনায় রামমোহনের চিন্তাধারা ও কার্যাবলী হলো ঊষা লগ্নের সেই প্রথম অরুনাভাস, যার মধ্যে মহত্বের সূর্যোদয়ের নিশ্চিত সম্ভবনা নিহিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, আরবি ফাঁসির মাধ্যমে ইসলামিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ও ইংরেজি মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে সহমর্মিতা বিশ্ব চিন্তা ধারার এই ত্রিবেদী সঙ্গম রামমোহনের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ শান্ত ও সমৃদ্ধ করেছিল। রামমোহন রায় আরবি, ফারসি, উর্দু সংস্কৃত প্রভৃতি বারোটি ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এবং তন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন হরি হরাণন্দ তীর্থ স্বামীর কাছ থেকে।

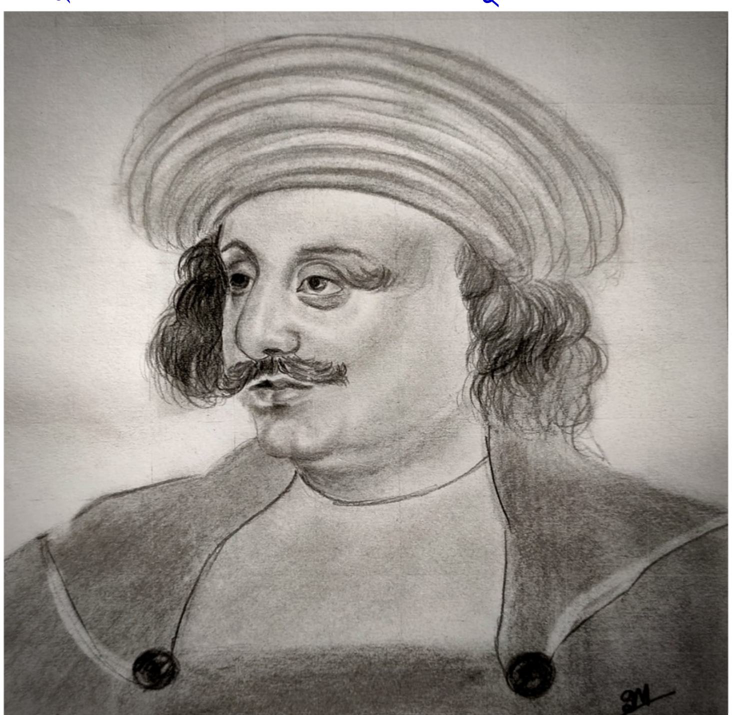

সুজাতা মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, সান্মানিক, করিমপুর পান্না দেবী কলেজ

১. রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তা:- আধুনিক অর্থে রাজা রামমোহন রায় কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলা যায় না। ভারত পথিক রামমোহন রায়কে অনেকে আধুনিক ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদার্শনিক হিসেবে অভিহিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন সমকালীন বাংলার একজন বিশিষ্ট জমিদার এলিট, বউ ভাষাবিদ পন্ডিত তথা বিজ্ঞানমনস্ক এক সমাজ সংস্কারক রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার প্রণালী ছিল আরোহী মূলক। তার রাষ্ট্রনীতির ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে বহু ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার

অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভিত্তিতে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্যে বেন্থাম ও মন্তেস্কুর চিন্তায় তাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলাফল ও ইংরেজদের জীবনধারার বিভিন্ন বিষয়ক রামমোহনের রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রভাবিত করে। ব্রিটিশ সমাজ ব্যবস্থায় শিল্প বিপ্লবের ফলাফল যখন প্রবালভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে তখন তার প্রভাব গ্রেট ব্রিটেনসহ পশ্চিমী রাষ্ট্রচিন্তায় পড়েছে এবং সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধ্যান-ধারণা বিকশিত হচ্ছে। ব্রিটিশ সংবিধানে ও সাংবিধানিক সরকারের উদারনৈতিক উপাদান সমূহ রামমোহনকে মোহিত করে। ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকার ভোগ রামমোহনকে মুগ্ধ করে এ থেকে তার ধারণা সৃষ্ট হয়েছিল যে, ব্রিটেনের মতো সাংবিধানিক বা সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করলে এবং ব্রিটিশদের সাথে ভারতীয়দের সংযোগ সহযোগিতা বৃদ্ধি করলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে। ও ভারতবাসীরা অধিকতর স্বাধীনতার সুযোগ পাবে।

২. রামমোহন রায়ের ধর্মচিন্তা:- সুফি ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে রাজা রামমোহন রায় পাটনায় আরবি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা কালে ইসলামী ভাবধারায় অবগত হন। মূল কোরআন থেকে শুরু করে ইসলাম ধর্ম আচার বিচার সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থ তথা-কম করে ৬৩ টি মুসলমান সম্প্রদায়ের মতাদর্শে জ্ঞান সঞ্চার করে। নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা অপু প্রধান নিরূপণ ভাবে দেখানোর জন্য তাকে জবরদস্ত মৌলবী আখ্যা দেওয়া হয়।

বারাসাতে সংস্কৃত শিক্ষাকালে তিনি হিন্দু শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করেন। পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে নিসকর্ষতার অন্তরে অনুপ্রবেশ করে পরবর্তী কর্মজীবনে তিনি খ্রিস্ট ধর্মে বিরাট সুযোগ পান। তার কাছে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না দুটোকেই তিনি মনুষ্য জীবনের অবিচ্ছেদ অঙ্গ রূপে আখ্যায়িত করতেন।

রামমোহন রায় পরমত ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন তার মত অনুযায়ী যে কোন ধর্ম শিকার বা অনুশীলনের অধিকার যে কোন নাগরিকের আছে। ধর্মীয় কারণে মানুষ মানুষের ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-বিবাদের বিরোধী ছিলেন। রামমোহন বিভিন্ন মত ও পথের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ ব্যবস্থা স্থানের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি যত মত তত পথ এর মতাদর্শকে অনুসরণ করার কথা বলেছেন। তার মতানুসারে প্রত্যেকের স্ব-স্ব ধর্ম মত ও ধর্ম পথ অনুসরণ করবে এক্ষেত্রে কেউ কারোর কোন রকম কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেনা। রামমোহন রায়ের মতে ঈশ্বরের কাছে সকলেই সমান এবং সকল ধর্মের মূল কথা অভিন্ন।

৩. রামমোহনের মতে সামাজিক ন্যায়:- সনাতন হিন্দু সমাজে বহুবিধ কুসংস্কার ও অন্যায় অবিচারের অবধি ছিল না।। এই সমস্ত সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় সক্রিয়ভাবে সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ন্যায়বিচারকে সুনিশ্চিত করার জন্য রামমোহন জাতীয় বর্ণ গত বিচারে ক্রমস্তর বিনষ্ট হিন্দু সমাজের বিরোধিতা করেছেন তিনি জাতিভেদ প্রথার প্রকার প্রকাশকে প্রতিহত করার জন্য সর্বপ্রকার এ উদ্যোগী হয়েছিলেন।

হিন্দু সমাজের ঐতিহ্যগত ধারা অনুসারে নারীজাতির উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম অসামঞ্জস্য আরোপ করা হতো। নারীদের উপর সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের অন্ত ছিল না, নারী স্বার্থ বিরোধী কিছু কিছু প্রথা ছিল নিত্যান্তই নিষ্ঠুর ও অমানবিক নারী জাতিকে সামাজিক নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের জন্য রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রকারের প্রয়াসই হয়েছেন। বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অবিচারের কারণে নারী জাতির দুঃখ ও দুর্দশা ও হীনমান্যতা বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন এককভাবে লড়াই চালিয়ে গেছেন। নারী-পুরুষের থেকে হীন এবং নারীগত বিচারের দুর্বল রামমোহন এ ধরনের বক্তব্যকে একেবারে অগ্রাহ্য ও বাতিল করে দিয়েছেন।

রাজা রামমোহন স্ত্রী শিক্ষার সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। সনাতন হিন্দু সমাজে সামাজিক অনাচার ও অবিচারের হাত থেকে মুক্তি প্রদানের জন্য রামমোহন নারী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। রাজা রামমোহন স্ত্রী শিক্ষাবিস্তার ও নারী জাতি স্বাধীনতার স্বার্থে সার্বিক উদ্যোগ আয়োজন গ্রহণ করেছেন।

পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ছিল অস্বীকৃত। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। শিক্ষা সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে রামমোহন নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এছাড়াও তিনি সহমরণপ্রথা, শিশু কন্যা বিক্রয়, বহু পতিত্যব্যবস্থা ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার আগে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বর্তমান ছিল, তখনো শিক্ষিত সচেতন কোন এলিট গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়নি। দেশ ও দেশবাসী স্বাধীনতার বিষয়টি চিন্তার সচেতন করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন রাজা রামমোহন রায়।

৪. রামমোহনের শিক্ষা চিন্তা:- ইংরেজরা এদেশে আসার পর তারা যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনে উদ্যোগী হন তার রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তার বাঁধানো বাদ ঘটে। একদল ইংরেজের ইচ্ছা ছিল টোলো শিক্ষা উন্নতি বজায় রাখা। অন্যদিকে মুম্বাইতে অলফিন স্টোন ও মনরো প্রমুখ ও ব্যক্তিরা

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এদের আরেক দল চাইতেন আরবি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদান করতে কিন্তু রাজা রামমোহন রায় দ্বিতীয় দলকে সমর্থন করেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ভূমিকা এতটাই ইতিবাচক ছিল যে ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি কলকাতা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে রামমোহনের যুক্তি হল-যাতে দেশবাসী পশ্চিমে শিক্ষা থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত না হয়। ভলতেয়ারের ও ইউক্লিডের বৈদান্তিক দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যা, রামমোহনকে প্রভাবিত করাই ১৮২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেদান্ত কলেজ। অমিত সেন ও স্বীকার করেছেন Ram Mohan was also on of the makers of Bengali prose.

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে ব্রিস্টল শহরের কাছে স্টেপ লোটানে মেনিনজাইটিস রোগে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে তার মৃত্যু শতবর্ষে, ১৯২৭ সালে তার জন্মের শতবর্ষে তাকে নিয়ে বিস্তার লেখালেখি হয়েছিল, নানা দিক থেকে তার চিন্তাভাবনা মূল্যায়ন করতে প্রয়াসই হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে অনেক দিকপাল মানুষ। তার জন্মের আড়াইশো বছরেও তাকে নিয়ে চর্চায় আজও লিপ্ত রয়েছেন অনেক বিদগ্ধ জন। কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোচনা, সেই ভারত পথিক রামমোহন কেন এতটা সম্ভ্রম আদায় করতে পারেন আজও এটির উত্তর হল তাকে ঘিরে চলমান একাধিক বিতর্ক, যা আজও অমীমাংসিত। রাজা রামমোহন রায় একদিকে যেমন এক বিতর্কে চিন্তক অপরদিকে তার চিন্তনই ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আড়াইশো বছর অতিক্রম করেও রামমোহন তাই আজও আমাদের ভাবান, তাকে আমাদের আজ ও সমীহ করে চলতে হয়।

২০২২ সালের ভারতের একজন নাগরিক হিসেবে যখন রাজা রামমোহনের দিকে নজরদী তখন কয়েকটি বিষয় বোধ হয় আমাদের খেয়াল রাখা প্রয়োজন। রামমোহন চর্চায় এই কথাগুলো উচ্চারিত হলেও রামমোহনের বিতর্কে তেমনভাবে স্থান পায়নি।

এক:- তিনি গোড়া, নিষ্ঠাবান, ব্রাম্ভন পরিবারের সন্তান হয়েও অক্লেশে বেদ উপনিষদ, কোরআন, বাইবেল আয়ত্ব করেছিলেন মূল ভাষায় সেগুলি পাঠ করে।

দুই:-রামমোহনের প্রতিপক্ষ ছিল ব্রাহ্মণ্য বাদ, পত্তলিকতা ও ধর্মের নামে হিন্দু সমাজে অবস্থানকারী যাবতীয় কুপ্রথা ও অনাচার। অর্থাৎ প্রাক আধুনিকতা।

তিন:- রামমোহন যে সময়ের ফসল, যাকে বিশিষ্টায়িত করেছিল এক সীমাহীন কাল রাত্রির অন্ধকার, তাকে ভেদ করার এই যে এক দুঃসাহসিক, এক প্রচেষ্টা, তার কীআবারো একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকায় রাজা রামমোহন রায়কে।

সমসাময়িক কালে চারপাশের ঘনায়মান সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে রামমোহন বহু ধরনের কাজে হাত দেন। দু একটি সমিতিও গঠন করেন। ভারতত্যাগ এর আগে স্থাপন করে যান ব্রাহ্মসমাজ, সম্ভবত তার গঠন উদ্যোগের চূড়ান্ত প্রয়াস। রাজা রামমোহন রায়ের ২৫০ তম জয়ন্তীতে তার প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি কে আমাদের এখনকার বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

জীবনপুরের পথিক তরুণ মজুমদারঃ(৮ই জানুয়ারি ১৯৩১- ৪ঠা জুলাই ২০২২):- বাংলা চলচ্চিত্র জগতের একজন বিস্ময়কর স্রষ্টা

অনন্যা পাল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

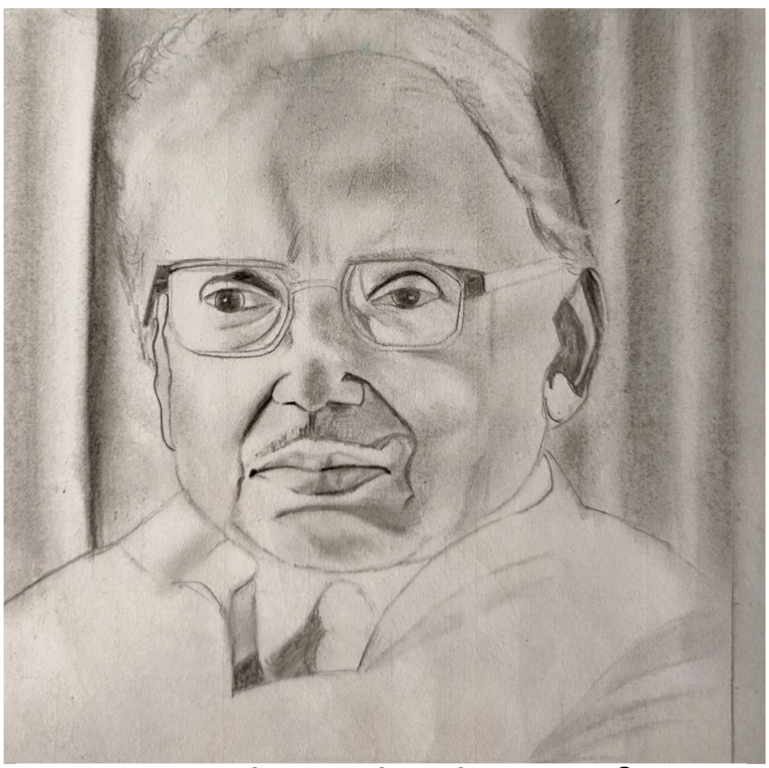
সুজাতা মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, সান্মানিক, করিমপুর পান্না দেবী কলেজ

তরুণ মজুমদার ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালির চিত্র পরিচালক। ব্রিটিশ ভারত বর্তমানে বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় ৮ই জানুয়ারি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি প্রথমে সেন্ট পলস ও পরবর্তীকালে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন। তরুণ বাবু মানুষটি গম্ভীর, নিয়মানুবর্তী ও সময়নিষ্ঠ। ভাবনা তার যতই গভীর হোক না কেন-- সারল্য তার সৃষ্টির প্রাণভোমরা এবং বৈচিত্র তার বিষয়চয়নে। তিনি তাঁর সহকর্মী ও বাঙালি অভিনেত্রীর সন্ধ্যা রায় কে বিয়ে করেন কিন্তু কয়েক বছর পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই ঘটনায় আঘাত পান তরুণ মজুমদার। তার চলচ্চিত্র পরিচালনার প্রথম জীবনে 'যাত্রীক' বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পরিচালক তরুণ মজুমদার, শচীন মুখার্জি

এবং দিলীপ মুখার্জির ত্রয়ী স্কিন নাম ছিল 'যাত্রীক'। যাত্রীক হিসেবে এই তিন পরিচালক চাওয়া-পাওয়া, কাঁচের স্বর্গ তৈরি করেছিলেন। যাত্রিক পরিচালিত শেষ ছবি পলাতক। পরবর্তীকালে প্রত্যেকে আলাদাভাবে পরিচালনা শুরু করে কৃতিত্ব অর্জন করেন। ৫৯ বছর ধরে তরুণ মজুমদারের বিভিন্ন ছবিতে উঠে এসেছে বিভিন্ন উপজীব্য--- কখনো প্রেম, কখনো পরিবার, কখনো সম্পর্ক, কখনো প্রান্তিক মানুষের জীবন, কখনো মধ্যবিত্তের পাওয়া না পাওয়ার গল্প। একদিকে বালিকা বধূ, নিমন্ত্রণ, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ফুলেশ্বরী থেকে এইটুকু বাসা, দাদার কীর্তি, আপন আমার আপন, আবার অন্যদিকে ঠগিনি, পলাতক, সংসার সীমান্তে, গণদেবতা, পথ ও প্রাসাদ বা মেঘমুক্তি। এর মধ্যে দর্শকের মন দাগ কেটে যাচ্ছে কুহেলি-র মতো থ্রিলারধর্মী ছবি। আবার আধুনিক সময় তৈরি করেছেন, ভালোবাসা ভালোবাসা,আলো, চাঁদের বাড়ি, ভালোবাসার বাড়ি কিম্বা গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত অধিকার। তরুণ বাবুর হাত ধরে উঠে আসছেন কত নবগত শিল্পী, এবং তাদের অভিনয়ের শৈলী মুগ্ধ করেছে দর্শককে। তারা যথা সময়ে স্টার হয়ে যাচ্ছেন তরুণ বাবুর মত এক শিক্ষকের হাত ধরে। দর্শকের ভারে উপচে পড়েছে ছবি ঘর। রবীন্দ্র সংগীতের গভীর অনুধাবন ও বৌদ্ধিক প্রয়োগে জমে যাচ্ছে সিনেমার সিকোয়েন্স। কিন্তু সেই 'স্টারডাম'-এর বিচ্ছুরিত আলো ধাঁধিয়ে দিতে পারছে না তরুণ বাবুর চোখ। সেই 'সিম্পল লিভিং', 'হাই থিঙ্কিং', বীক্ষা পাথেয় করে সুঠাম বাম মতাদর্শের নৌকায় ছই কাটিয়ে এগিয়ে চলেছেন এক আপাদমস্তক ভদ্রলোক বাঙালি। আসলে তিনি মানুষটাই বিরল। মূল্যবোধ যখন অবক্ষয় ও সৃষ্টি যখন আপসের জরায় আক্রান্ত, তখনও তাঁর 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস' অটল। শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধ আছে---- এই কথাটাই তিনি বলে গেলেন জীবন দিয়ে। তার সংগ্রহে রয়েছে চারটি জাতীয় পুরস্কার,সাতটি বি.এফ. জে.এ সম্মান, পাঁচটি ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ও একটি আনন্দলোক পুরস্কার। ১৯৯০ সালে তাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়। বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার বহুদিন ধরে কিডনির সমস্যা, ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। ৪ঠা জুলাই সোমবার ১১:১৭ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার জীবন যেন অনাড়ম্বর ছিল---- বিদায় কালেও দেহদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল আড়ম্বর উপেক্ষা করেই। জীবন যখন উত্তীর্ণ হল শূন্যতায়---- সেই মহাপ্রস্থানের পথেও শরীর ছুঁয়ে রইল একটি লাল পতাকা ও গীতাঞ্জলি। সে বড় দীর্ঘ যাওয়া। তার ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে দান করা হয় তার চোখ এবং মরদেহ। তরুণ মজুমদার যেন এমন এক আলোর নাম যে আলো কখনো নেভেনা বরং সময় পেরোলে তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

সাম্প্রতিক ইস্যু

AFSPA: স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরে সমস্যা না সমাধান

যুক্তালেখা রায়, স্নাতকোত্তর পাঠরত শিক্ষার্থী, তৃতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী

কি এবং কেন?

AFSPA সাম্প্রতিক কালে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা যায়। AFSPA কথাটির অর্থ Armed Forces Special Power Act অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বিশেষ কিছু ক্ষমতা প্রদান। এই ক্ষমতা ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বারা স্বীকৃত পায় এবং ১৯৫৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর আইনে পরিণত হয়। সশস্ত্র বাহিনীকে এই বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে দমন করার জন্য। এছাড়া পরবর্তীকালে দেশে অভ্যন্তরীন কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে কিংবা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তা এক কথায় দেশের অশান্তকর অঞ্চল গুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার সশস্ত্র বাহিনীর মোতায়ন করতে পারে। এই সশস্ত্র বাহিনী হাতে যে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তার মধ্যে কতকগুলি হলো - সশস্ত্র বাহিনী যে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার করতে, যদি কোন ব্যক্তিকে মনে হয় এই ব্যক্তির সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বা সমাজে বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে তবে সেই ব্যক্তিকে সশস্ত্র বাহিনী নির্দ্বিধায় জনসমক্ষে গুলি করে হত্যা করতে পারে, সন্দেহ হলে যে কোন ভবন বা গাড়ি বা কোন ব্যক্তিকে ওয়ারেন্ট ছাড়াই তল্লাশি করতে পারে এবং সন্দেহ হলে ভবন ধ্বংস করতে পারে কিন্তু এসবের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনরকম আদালতে মামলা দায়ের করা যাবে না। আবার যদি সন্দেহ হয় কোথাও জঙ্গিদের ঘাঁটি রয়েছে তবে সে কি উড়িয়ে দিতে পারবে। সর্বোপরি এই আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সেরা আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনোরূপ তদন্ত হবে না এবং কোনরূপ আইডি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

সমস্যা কোথায়?

প্রথম দিকে সশস্ত্র বাহিনী তার ক্ষমতা সততার সাথে প্রয়োগ করলে ধীরে ধীরে তারা এই বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে যার ফলে সশস্ত্র বাহিনীর অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবন অনেক সময়

বিপন্ন হয়ে পড়ে। কখনো সন্দেহের বশে আবার কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক সাধারণ মানুষ শোষিত নির্যাতিত হয়। যেসব অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী করা হয় সেইসব অঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব গোপনীয়তা থাকে না। তাই সশস্ত্র বাহিনীর এই বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে অনেকের সমালোচনা করে এবং বিশেষ কিছু কারণের জন্য বলা হয় এই আইনটি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

১৯৮৩ সালে ৬ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার পাঞ্জাব এবং চন্ডিগড়ে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (AFSPA) প্রণয়ন করেন এবং ১৯৮৩ সালের ১৫ই অক্টোবর সমগ্র পাঞ্জাব এবং চন্ডিগড়ে তা কার্যকর করা হয়। এরপর আইনটি প্রয়োগ করা হয়েছিল ১৯৯০ সালে ৫ই জুলাই যখন উপত্যকার সমগ্র আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। এবং তৎকালীন রাজ্য সরকার কাশ্মীর উপত্যকাকে AFSPA এর ধারা ৩-এর অধীনে একটি অশান্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। পরে ২০০৪ সালে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার জম্মু-প্রদেশেও বিরক্তিকর এলাকার ঘোষণা করে। বর্তমানে এই আইনটি জম্মু ও কাশ্মীরের সমগ্র অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৫৮ সালে আসামের কিছু অংশ AFSPA এর অধীনে আসে। কিন্তু ১৯৯০ সালে সমগ্র আসামকে অশান্ত এলাকার হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে ভারতের আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মনিপুর অঞ্চলের কয়েকটি জেলা এবং নাগাল্যান্ডের কয়েকটি জেলায় এই AFSPA Act জারি রয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে রিপোর্ট অনুযায়ী নাগাল্যান্ডের ৭টি জেলা এবং ১৫টি থানা AFSPA -র আয়ত্ত থেকে সরানো হচ্ছে।

প্রতিবাদ কেন?

এই যে সমস্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন ছিল সেই সব এলাকার মানুষেরা বিশেষত মহিলারা নির্যাতিত হয়েছিল সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃক; শুধুমাত্র পুরুষ এবং মহিলারা নির্যাতিত হয়েছিল তা নয় শিশুরাও যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। সাম্প্রতিক নাগাল্যান্ডের মোতায়েন সশস্ত্র বাহিনী ৪ঠা ডিসেম্বর মোন জেলার ওটিং-র কাছে ১৩ জন নাগরিককে হত্যা করে। ২০০০ সালে ২ই নভেম্বর মনিপুরের নালোমে একটি বাসস্টপ এ অপেক্ষা করার সময় প্রায় ১০ জন সশস্ত্র বাহিনীর সেনাদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। অনেক নারী ধর্ষিত হয়েছেন। ২ আসাম রাইফেলস্ সৈন্যদের সামনে একজন মহিলাকে সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা হয়, যা 'অপারেশন ব্লুবার্ড" নামে পরিচিত এবং এটি একটি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃক ঘৃণ্য আচরণ।

সশস্ত্র বাহিনীর সেনাদের কাছে এরকম অমানবিক কাজ একেবারেই কাম্য নয়। অনেকে এই আইন তীব্র সমালোচনা করে। এবং বলা হয় এই আইন মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত করছে। যেসব

অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়, সেই সব অঞ্চলের মানুষদের নিজস্ব privacy (গোপনীয়তা) বলে কিছু থাকেনা। তাই অনেক এই আইনের অনেকে সমালোচনা করেন। সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেছেন। যেমন ইরম শর্মিলা AFSPA বাতিলের জন্য দীর্ঘ ষোল বছর ধরে অনশন করে। এই অনশন করা হয়েছিল মনোরমা দেবীর ন্যায় বিচারের জন্য - মনোরোমা দেবী ২০০৪ সালের রাইফেলস কর্মীদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন এবং হত্যা করা হয়েছিল। এইরকম আরো অনেকে বিশেষত মহিলারা নির্যাতিত হয়েছে। এইজন্যই অনেকে বলেছেন এই আইনের দ্বারা মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, হয় এই আইন বাতিল করার প্রয়োজন নয়তো সংশোধন। সাম্প্রতিক সময়ে এই আইনটি ঠিক কি ভুল এই নিয়ে মতবিরোধ চলছে।

মরার উপর খারার ঘা: সংকটে শ্রীলংকা

রিংকি বিশ্বাস, স্টেট এডেড কলেজ টিচার, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

"মরার উপর খারার ঘা"- একবাক্যে এটাই শ্রীলঙ্কার বর্তমান সংকটের ব্যাখ্যা। ভারতের প্রতিবেশী দ্বীপ রাষ্ট্রটির এহেন লঙ্কাকাণ্ডের কারণ বুঝতে হলে কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করতেই হবে।

পর্যটন নির্ভর শ্রীলংকা:

প্রতি বছর কেবলমাত্র পর্যটন শিল্প থেকে শ্রীলঙ্কা ৫ থেকে ৭ বিলিয়ন ডলার রোজগার করে কিন্তু গত দুই বছরের কোভিডকালে সেই রোজগার কার্যত শূন্যতে ঠেকেছে। যা শ্রীলংকার অর্থনীতিতে ব্যাপক আঘাত হেনেছে, তাছাড়া ২০১৯ সালের কলম্ব সন্ত্রাসী হামলাও পর্যটনে মার খাওয়ার অন্যতম কারণ। যার ফলে বিদেশী মুদ্রা ভান্ডার শ্রীলংকার কমে যায়।

শ্রীলঙ্কাবাসীর ভোগান্তি:

শ্রীলঙ্কায় আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির তীব্র সংকট প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে এক কাপ চায়ের মূল্য ১০০ টাকা, চাল ৫০০ টাকা কেজি, চিনি ৪০০ টাকা কেজি, শিশু খাদ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, অপ্রতুল জীবনদায়ী ঔষধ, কাগজের অভাবে

সেখানে বন্ধ স্কুল কলেজ। সেখানকার সরকারকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে রাসায়নিক সার কিনতে হয় বিদেশী মুদ্রায়, সেই খরচ কমাতে রাতারাতি রাসায়নিক সার আমদানি নিষিদ্ধ করেছিল রাজাপক্ষে সরকার। ফলস্বরূপ সেখানে কৃষিজপণ্য উৎপাদন কমে যায়। ধান ও চায়ের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বর্তমানে শ্রীলঙ্কাকে বাংলাদেশ থেকে চাল আমদানি করতে হচ্ছে। দ্বীপবাসীদের অর্থনৈতিক সংকট এতটাই তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে শ্রমিকরা তাদের যৎসামান্য উপার্জন দিয়ে জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। গণমাধ্যমে জানা যায় যে এই তীব্র সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে বহু শ্রীলঙ্কাবাসী ভারতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে, উদ্বাস্তু শ্রীলঙ্কা বাসীদের জন্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি কেন্দ্র সরকারকেও এই বিষয়টির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর আবেদন জানিয়েছেন। ভারত সরকার শ্রীলঙ্কার গৃহহীনদের বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে সহায়তা প্রদান করে, কিন্তু সরকারের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো। দীপ রাষ্ট্রটির মিত্র হিসাবে ভারত সরকার গত ছয় মাস একাধিক ক্ষেত্রে শ্রীলঙ্কাকে বিভিন্ন সহযোগিতা যুগিয়েছে।

চীনা ফাঁদে দ্বীপরাষ্ট্র:

রাজাপক্ষে সরকারের চিনা মুখী নীতি দ্বীপ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সংকটকে আরো প্রবল করেছে। চীনের থেকে বিপুল পরিমান ঋন নেয় শ্রীলঙ্কা, সেই টাকায় তৈরি হয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর প্রভৃতি। সেখান থেকে যতটা আয় হবার আশা সরকার করেছিল, তার অর্ধেকও না হওয়ায়, আয় এর চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে ঋণ পরিশোধ করতে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, চীনকে সমস্ত বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিতে বাধ্য হয় রাজাপক্ষে সরকার। শ্রীলঙ্কার সহজতর শর্তে ঋন না পাওয়া বা লাভজনক শর্তে বিদেশী বিনিয়োগ না পাওয়ার সুযোগ নিয়েছে চীন। যে দেশ কোথাও থেকে ঋণ পায়না তাকে ঋণ দেওয়া চীনের ইদানিংকার আগ্রাসিনী নীতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যার নাম দিয়েছে "ডেথ স্ট্র্যাপ ডিপ্লোম্যসি "-ঋণের দায়ে জড়িয়ে ফেলার কূটনীতি। শ্রীলংকা জুরে চীনের লগ্নিই সেখানকার অর্থনীতিতে ভরাডুবির এক অন্যতম কারণ।

পরিবার তন্ত্রের অভিশাপ: শ্রীলংকার বর্তমান পরিস্থিতি কি শুধুই অর্থ ব্যবস্থাকে সামলাতে না পারার ফল? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, না শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যর্থতা নয় রাজা পক্ষের পরিবারের দুর্নীতির ফল হল এই পরিস্থিতি। শ্রীলঙ্কার রাজাপক্ষে পরিবার, যে পরিবারের এক ভাই দেশের রাষ্ট্রপতি, অন্য ভাই প্রধানমন্ত্রী আর বাকি দুই ভাই ও তাদের ছেলেমেয়েদের অধীনে রয়েছে

গুরুত্বপূর্ণ সব সরকারি দপ্তর। এই পরিবারটির দেশ চালানোর এই ভঙ্গিমা থেকে স্পষ্ট দেশটির এমন বিপর্যয়।

সিংহলি আধিপত্যবাদের হুঙ্কার :

দ্বীপ রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিঃস্বার্থ সমর্থন ছিল রাজা পক্ষের পরিবারের প্রতি। মাহিন্দ্রা রাজা পক্ষে এই সিংহলি জাতীয়তাবাদের ভাবাবেগকে ব্যবহার করেই ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন। তিনি জানতেন এই সিংহলি জাতীয়তাবাদের পালের হাওয়ায় তাকে টেনে নিয়ে যাবে তার ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে।

সংকীর্ণ জাতি স্বার্থ, নিজ জাতির জাত্যাভিমান, অপজাতির প্রতি ঘৃণা উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। ইতিহাস সাক্ষী উগ্র জাতীয়তাবাদের সবসময়ই কোন না কোন শত্রুপক্ষের প্রয়োজন হয়, সংকীর্ণ জাতি স্বার্থ চরিতার্থ করতে। সেখানে দুর্বল হয়ে যাওয়া তামিল জনগোষ্ঠীকে দিয়ে সেই কাজ না হওয়ায়। নতুন শত্রু হিসেবে বেছে নিয়েছিল সংখ্যালঘুদের, যেমনটা কমবেশি প্রায় সব দেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে হয়ে থাকে। দ্বীপ রাষ্ট্রে বড় মাপের কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হলেও সেখানকার সংখ্যালঘুরা ক্রমেই কোন ঠাসা হয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যবাদ দিয়ে অর্থব্যবস্থার উন্নতি করা খুব কঠিন। দীর্ঘ সিংহলি-তামিল গৃহযুদ্ধ থমথমে হলেও সেখানে জাতিগত অবিশ্বাসের আবহে অর্থ ব্যবস্থা গুটিয়েই থেকে গেছে। শ্রীলঙ্কায় লগ্নি করতে ভয় পেয়েছে বিভিন্ন দেশ।

রাজাপক্ষদের প্রতি মোহভঙ্গ: "অনাচার কর যদি রাজা তবে ছাড়ো গদি "-এই মন্ত্রই উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিটি শ্রীলঙ্কাবাসীর মুখে। সিংহলি জাতীয়তাবাদকে ব্যবহারের প্রতিবাদে সজাগ হয়েছে সেখানকার মানুষ,তারা বুঝেছে, তারা ঠেকে শিখেছে যে লড়াইটা জাত নিয়ে নয় বরং ভাত নিয়ে করাই শ্রেয়। এতদিন সিংহলীরা রাজাপক্ষীদের উপর খুশি ছিল, খুশি ছিল আন্তর্জাতিক চাপের কাছে দেশের রাষ্ট্রপ্রতির মাথা না নোয়ানোর নাটকেও কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, চরম অর্থনৈতিক ভরাডুবি, তাদের মোহভঙ্গ করলো। তাইতো তারা "দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান খান"- এই দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে গোটা দেশ জুড়ে দুর্নীতিবাজ, অযোগ্য, স্বার্থান্বেষী সরকার ফেলার জন্য রাস্তায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

লঙ্কাকাণ্ড থেকে শিক্ষনীয়: শ্রীলঙ্কার এহেন লঙ্কাকাণ্ড থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যারা নেতা -কর্তা-বিধাতারা রয়েছেন তারা কি কিছু শিখবে? এর উওর সময় বলবে। তবে শ্রীলংকা একটা মস্ত বড় বার্তা দিয়ে গেল- সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যের, আগ্রাসনের, পথে হাটতে গিয়ে গণতন্ত্রের ধ্বংস করলে, মাফিয়া তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করলে, চারপাশে শুধু 'জো হুকুম',

'জি হুজুর', 'আজ্ঞে প্রভু'দের জায়গা দিলে শেষ পর্যন্ত ফল হবে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ। ১২ই মে ২০২২ এ রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে প্রবীণ রাজনীতিবিদ, অতীতের চারবার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী, ইউএনপি দলের সুপ্রিমো রাজনীতিবিদ রনিল বিক্রমাসিংহ কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। ৯ই জুলাই শ্রীলঙ্কার বিক্ষিপ্ত জনতা প্রদর্শন ওপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি দপ্তরে হামলা করে পাথর ছুড়ে এবং প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় এর ফলে রাষ্ট্রপতি গোতাবায়ে রাজাপক্ষে কে পদত্যাগ করতে হয় এবং অনিল বিক্রমাসিংহ অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ২২ শে জুলাই সেখানকার পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা দীনেশ গুণাবদ্দানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন,এই নবনির্বাচিত সরকার কি পারবে দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করতে এবং দেশটিকে পুনর্জীবিত করতে? দিনেশ গুনাবদ্দনে সরকার পারবে নতুন ভোর আনতে শ্রীলঙ্কা বাসীদের জীবনে?এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অদূর ভবিষ্যৎ বলবে! শ্রীলঙ্কা বাসীদের অদৃষ্টে কি আছে তা দেখতে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে। তবে দ্বীপ রাষ্ট্রের প্রতিবেশী নাগরিক হিসেবে আমরা প্রার্থনা করব খুব তাড়াতাড়ি শ্রীলংকা এই চরম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠুক।

পাকিস্তান সমস্যা

রুবিনা খাতুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার, সাম্মানিক, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ২১, ২৭, ৪২, ৬৩১ এর অধিক জনসংখ্যা নিয়ে এটি বিশ্বের ৫ম বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং আয়তনের দিক থেকে তম ৩৩তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার ফলে ভারত প্রজাতন্ত্র ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান দুটি স্বাধীনরাষ্ট্রের বিকাশ ঘটে। ফারসি সিন্ধি ও উর্দু ভাষায়, 'পাকিস্তান' নামটির অর্থ 'পবিত্রদের দেশ'। নামটি আসে পাকিস্তানের তৎকালীন পশ্চিম অংশের পাঁচটি রাজ্যের নাম থেকে। ১৯৩৩ সালে চৌধুরী রহমত আলী তার "Now Or Never" পুস্তিকায় এই নামটির প্রস্তাব রাখেন।

সাম্প্রতিক সমস্যার প্রকৃতি: পাকিস্তানে এই বছরের গোড়া থেকে আবার এক প্রস্থ রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে। দুটি প্রধান বিরোধী দল নওয়াজ শরীফের

পাকিস্তান মুসলিম লীগ আর আসিফ জারদারি আর তার ছেলে বিলাওয়াল ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি একজোট হয়ে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছে। ভোটাভুটি হলে সরকার পড়ে যাবে, এই আশঙ্কায় সম্ভবত ইমরানের নির্দেশে ডিপুটি স্পিকার তড়িঘড়ি সংসদ ভেঙে দিয়েছেন। কাজটা সংবিধান তথা গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসারে হয়েছে নাকি ইমরানের গদি আঁকড়ে পড়ে থাকার চাল, সে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। বিরোধীরা তখনই আদালতের দ্বারস্থ হয়। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সংসদ ভেঙে দেওয়া মোটেই সংবিধান সম্মত হয়নি। শেষে পাক সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ৩৪২ সংসদ সদস্যের মধ্য ১৭৪ জন ইমরান সরকারের বিপক্ষে ভোট দিয়ে প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তির রাজনৈতিক ইনিংসে আপাতত একটা বড় দাড়ি টেনে দিয়েছেন। পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী এখন শাহবাজ শরীফ, প্রাক্তন।

প্রধানমন্ত্রীর পদচ্যুতি ও উদ্ভূত সমস্যা: ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত নয় নয় করে ২২বার প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে পাকিস্তান। ইমরানই ছিলেন ২২তম। কিন্তু এদের কেউই কোন বার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। পাকিস্তান ২২বার প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার সত্বেও ব্যর্থ হয়েছে,মাঝপথে খুন হতে হয়েছে কাউকে, কারও গলায় পড়েছে ফাঁসির দড়ি, দুর্নীতি অবস্থার জেরে পদ ছাড়ার উদাহরণও রয়েছে অনেক।ইমরানের হাত ধরে আস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া প্রধানমন্ত্রীও এবার পেল পাকিস্তান। একই সঙ্গে মেয়াদ পূর্ণ করতে না পারা পূর্বসূরী প্রধানমন্ত্রীদের দলেই নাম লেখালেন ইমরান।

পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ২০১৮ সালের ১৮ই আগস্ট পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ২০২৩ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আস্থাভোটে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে তাকে। আস্থা ভোটে পরাজিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনও তিনি ছেড়ে দিয়েছেন বলে খবর। পাকিস্তানের ইতিহাসে এই প্রথমবার একজন প্রধানমন্ত্রীকে অনাস্থা ভোটে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা ছাড়তে হলো।

পাকিস্তানের ধারাবাহিক সমস্যা: ইমরানের পরিণতি অবশ্য পাকিস্তানের সমস্যার শেষ নয়।তিনি রেখে গেছেন একটি ভাঙা দেউলিয়া অর্থনীতি যা সম্পূর্ণ ধসে পড়ার দোরগোড়ায় রয়েছে,এক বিভক্ত ও বিষাক্ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, উত্তেজনাপূর্ণ বৈদেশিক সম্পর্ক একটি শাসন নীতি অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ, এবং একটি প্রশাসন যা সম্পূর্ণ বিশৃংখলার মধ্যে রয়েছে।তার উত্তরসূরি আজকে শাহবাজ শরীফ দেশকে আবার সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে বিশাল সমস্যার মুখোমুখি

হয়েছেন।তার সমস্যা হলো যে তিনি একটি নিখুঁত ঝড়ের মত অবতরণ করেছেন। এবং তার হাতে একদম সময় নেই। পাকিস্তানের সংকটকাল এসে গেছে,কিন্তু শাহবাজের ব্যবস্থা নেওয়ার জায়গা খুবই সীমাবদ্ধ।পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা সবেমাত্র উন্মোচিত হতে শুরু করেছে। এবং শাহবাজের পক্ষে মাথায় কাঁটার মুকুটটি পড়ে থাকা খুব সহজ হবে না।শাহবাজকে নানা রঙের জোট নিয়ে কাজ চালাতে হবে।

পাকিস্তানের চলতি অর্থনৈতিক সমস্যা : সব চ্যালেঞ্জের মধ্যে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনৈতিক। এর কোন চটজলদি সমাধান উপলব্ধ নেই। যে কোনো সামরিক সহায়তা হয় সৌদি আরব,চিন বা সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার, না হলে ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ডের (আইএমএফ) থেকে জরুরী তহবিল পাকিস্তানকে খুব বেশিদূর নিয়ে যাবে না, শুধু কয়েক মাসের জন্য বিপর্যয় স্থগিত করবে। পরিস্থিতি কেমন? রুপি ভেঙে পড়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বিপজ্জনকভাবে কম এবং সেটুকুই দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সুদের হার বাড়ানো হয়েছে যা ব্যবসার উপর ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলবে এবং ঋণ পরিশোধ ব্যয় এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবে যেখানে এমনকি প্রতিরক্ষা ব্যয়ের বড় অংশ ঋণের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ভর্তুকি তুলে নিতে হবে এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ এর দাম বিরাট ভাবে বাড়াতে হবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানে রূপির বিনিময় হার ২০০ রূপিতে এক ডলারের স্তর অতিক্রম করতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে, পেট্রোলের দাম প্রায় ৫০-৬০ পাকিস্তানি রুপি, অর্থাৎ প্রায় ৩০-৪০ শতাংশ বাড়াতে হবে। কিন্তু নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে ভোটারদের উপর এ ধরনের দায় চাপানোর সামর্থ্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেই। কাজেই আপাতত একটি রাজনৈতিক সরকার যা করবে তা হল অর্থনীতি যাতে ডুবে না যায় সে জন্য সামান্য কিছু রদবদল সত্যিকারে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনের পরে ক্ষমতায় আসা নতুন সরকারকে।

ভারতে ১৬ তম রাষ্টপতি নির্বাচন ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

সৌরভ স্বর্ণকার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার, সাম্মানিক করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস - ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতের জন্য গণপরিষদ করে গণপরিষদে অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হয় যে ব্রিটেনের অনুকরণে ভারতে ক্যাবিনেট বা সংসদীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রর শীর্ষে থাকবেন একজন রাষ্ট্রপতি এবং তাকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক জন ভোটদাতা চাইলে এক জনের বেশি প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। তবে প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম পছন্দ কে তা-ও ভোট দেওয়ার সময় জানাতে হয় ওই ভোটদাতাকে।ভোটদাতা প্রথম পছন্দ জানানোর পর তবেই তাঁর ব্যালট পেপার বৈধ বলে গণ্য হয়। ভোটারদের পছন্দ করা বাকি প্রার্থীদের ঐচ্ছিক হিসেবেই ধরা হবে। তবে চাইলে কোনও ভোটাদাতা এক জন প্রার্থীকেও পছন্দের প্রার্থী হিসেবে বেছে নিতে পারেন।লোকসভা এবং পাশাপাশি ভারতের ২৮টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লি ও পুদুচেরি বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যেরাও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন। তবে প্রত্যেক ভোটারদের ভোট মূল্যও আলাদা আলাদা। কারও ৭ তো কারও ২০৮। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, সোজাসাপ্টা গণনার ইভিএমে এই পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণের হিসেব কষা সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার আরও জটিল হিসেব কষার যন্ত্র। চালু ইভিএমে এক জন ভোটদাতা চাইলেও একের অধিক প্রার্থীকে কখনই ভোট দিতে পারেন না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এক জনের ভোটমূল্য একের অধিক। পাশাপাশি ভোট দেওয়া যায় একাধিক প্রার্থীকে। ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি খুব জটিল। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতো পরোক্ষভাবে একটি নির্বাচক সংস্থা দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচন সংস্থা গঠিত হয় ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষের এবং রাজ্য বিধানসভা গুলির একমাত্র নির্বাচিত সদস্যের নিয়ে নির্বাচিত সদস্যরা, শুধু ভোট দিতে পারে মনোনীত সদস্যরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে হলে প্রার্থীকে ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং তার বয়স ৩৫ বছর পূর্ণ হতে হবে। সংসদের প্রথম পক্ষের অর্থাৎ লোকসভার প্রার্থী হওয়া মতো তার যোগ্যতা থাকতে হবে তিনি সরকারি কোন লাভজনক পদে আসীন থাকতে পারবেন না। এছাড়া প্রার্থীকে জামানাথ হিসেবে ১৫ হাজার টাকা জমা দিতে হবে এবং তার প্রার্থী পদ ৫০ জন দ্বারা প্রস্তাবিত এবং অন্য ৫০ জন দ্বারা

সমর্থিত হতে হবে।নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি কে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণ করে কার্যভার গ্রহণ করতে হয় শপথ গ্রহণের সময় রাষ্ট্রপতি এই মর্মে ঘোষণা করেন যে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্ব পালন করবে, সংবিধান ও আইন সংরক্ষণ করবেন এবং ভারতের জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করবেন। ১৫ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হয়েছে কিছুদিন আগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু এবং কংগ্রেস, তৃণমূল, বাম-সহ বিরোধী শিবিরের যশবন্ত সিন্হার মধ্যে। ইতিহাস বলছে, পূর্ববর্তী ১৫ বারের মধ্যে ১৪ বারই দেশের এক নম্বর নাগরিক হওয়া নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হয়েছেন মোট ১৪ জন। এক মাত্র প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ দু'বার ভোটে জিতে রাইসিনা গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জেতার রেকর্ডও রাজেন্দ্রপ্রসাদের। অন্য দিকে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পেয়ে জেতার নজির ১৯৬৯ সালে ভিভি গিরির। ১৯৫৭ সালে মোট ভোটের ৯৮.৯৯ শতাংশ পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। সেই রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ। তার আগে ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৮৩.৮১ শতাংশ ভোট পেয়ে জিতেছিলেন তিনি। ১৯৫৭ সালের ৬ মে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ পেয়েছিলেন ৪ লক্ষ ৫৯ হাজারেরও বেশি। ওই নির্বাচনে অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, চৌধুরি হরি রাম এবং নারায়ণ দাস তিন হাজারের গণ্ডিও পেরোননি। ২০১৭ সালে পঞ্চদশ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৩৫৮ বৈধ ভোটের মধ্যে রামনাথ কোবিন্দ পেয়েছিলেন ৭ লক্ষ ২ হাজার ৪৪টি ভোট। শতাংশের হিসাবে ৬৫.৬৫। গত চার দশকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ইতিহাসে জয়ী প্রার্থীর সবচেয়ে কম ভোট পাওয়ার নজির এটাই। ২০১৭-র নির্বাচনে রামনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার পেয়েছিলেন ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩১৪টি ভোট। কংগ্রেসে-সহ কয়েকটি বিরোধী দল সমর্থিত প্রার্থী মীরার প্রাপ্তি ছিল প্রায় ৩৪.৩৫ শতাংশ ভোট। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের এক মাত্র নজির নীলম সঞ্জীব রেড্ডির। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন শাসক দল জনতা পার্টি সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পেশ করেছিলেন তিনি। রেড্ডির ৩৬ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মনোনয়ন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা - ব্রিটিশ রাজাবা রানীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতির নামে দেশ শাসিত হয় সকল ক্ষমতায় আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে নিয়ে ন্যস্ত সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে the executive power of the union shall be vested in the president। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সাধারণভাবে সাত ভাগে ভাগ করা যায় তিনি প্রধানমন্ত্রীও এবং

মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন যেমন রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভারতের রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেন তাছাড়া ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল অডিট অর জেনারেল রাষ্ট্রপতি ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী সর্বাধিনায়ক তিনি এই পদধিকার বলে বিমান স্থল এবং নৌ বাহিনীর প্রধান কে নিযুক্ত করেন তিনি জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির প্রধান তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা -ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতার মধ্যে পড়ে ৩৫২ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে যুদ্ধ বা বহিঃক্রমণ বা সন্ত্রাসবাদ জনিত কারণে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারে। চীন ভারতের সীমান্ত যুদ্ধের জন্য ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাক ভারতের যুদ্ধের সময় দ্বিতীয় বার অভ্যন্তরীণ কারণে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয়বার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। এছাড়াও রাজ্যপালের প্রতিবেদন বা অন্য কোন সূত্র থেকে সংসদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাহলে তিনি সংবিধানে ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী সেই মর্মে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

সংবিধানে ৩৬০ নম্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। ভারতে এখনো পর্যন্ত একবারও জাতীয় অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা -সংসদ আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপতির বেতন ভাতা ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয় বর্তমানে পেনশন রাষ্ট্রপতির মাসিক ৫ লাখ টাকা বেতন পান এছাড়া অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ পান তিনি মাসিক করমুক্ত পঁচাত্তর হাজার টাকার পেনশন পান যখন তিনি ওই পদ থেকে অবসর নেন বা পদত্যাগ করেন । ১৯৫১ অনুসারে একজন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি চিকিৎসা ভাতা ও দেশ-বিদেশে ভ্রমণ একজন সাথী সহ সর্বোচ্চ শ্রেণীর টিকিট রেল ও বিমানে পরিষেবা পায়। রাষ্ট্রপতি পদে থাকাকালীন তার বেতন বা ভাতা হ্রাস করা যায় না এছাড়া রাষ্ট্রপতি নিজের থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন ও যাতায়াতের জন্য যানবাহনের সুযোগ পান।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা -রাষ্ট্রপতি স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ম তান্ত্রিক প্রধান হলেও তিনি এক মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন পদের অধিকারী। ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতীয় এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। দেশের স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সার্বিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মন্ত্রিসভা শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে না-রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভা কে প্রয়োজনে পরামর্শ দিয়ে এবং চালনা করে নিছক নিয়ম তান্ত্রিক প্রদানের উর্ধ্বে উঠতে পারেন। ব্রিটেনের রানীর মতো ভারতের রাষ্ট্রপতি পরামর্শদান, উৎসাহদান এবং সতর্কীকরণের ক্ষমতা রয়েছে।

প্রচ্ছদ প্রবন্ধ

৭৫ বছরে ভারতের বিদেশেনীতির মূল্যায়ন

বর্ষা খাতুন, ষষ্ঠ সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ভারত স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল গণতন্ত্র হিসেবে পরিচিত ভারতবর্ষ। ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য ভারতের বিদেশনীতিতে গভীরভাবে প্রভাবফেলে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত 75 বছর ধরে ভারতের বৈদেশিক নীতি নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারতের বিদেশ নীতির মূল নীতিগুলি এখনো প্রায় একই রয়েছে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলে যায়, আর এই পরিবর্তন পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে গিয়ে ভারতের বিদেশনীতির কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে। ভারত যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ সেহেতু বিদেশনীতির নির্বাচনের মূল দায়িত্ব থাকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে। তাই সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ নীতির পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু(1947-68):- ভারতের পররাষ্ট্রনীতির জনক হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি ছিলেন একজন শান্তিকামী আদর্শবাদী মানুষ।তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জোট নিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, এবং বিশ্বশান্তি কে ভারতের বিদেশ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। যুদ্ধ বিরোধী পৃথিবীর স্বপ্নে আস্থাশীল নেহেরু ভারতকে সামরিক শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন না। 1950 এর দশকে নেহরুর প্রণীত বিদেশনীতিতে বিরাট ধাক্কা আসে 1962 সালে চীনের আক্রমণ এবং 1965 সালে পাকিস্তানের আক্রমণের মধ্য দিয়ে। 1962-এর যুদ্ধে চীনের একতরফা সামরিক আগ্রাসন নেহরুর অনুসৃত ভারতের বিদেশনীতির দুর্বলতাগুলিকে সামনে এনেছিল। 1962-এর যুদ্ধ ছিল ভারতের বিদেশনীতিতে ‘জল বিভাজিকা। এই প্রথম ভারতের বিদেশনীতিতে আদর্শবাদী ভাবনার পরিবর্তে বাস্তববাদী ভাবনার প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়েছে।

লাল বাহাদুর শাস্ত্রী(1964-66):- 1964 সালে জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয় এবং বাস্তববাদী দিক থেকে বিদেশনীতি রূপায়নে জোর দেন। 1965 সালে

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিরাপত্তা ভাবনাকে আরো শক্তিশালী করেন। শাস্ত্রীজির স্লোগান "জয় জওয়ান জয় কিষান"-এর মধ্যে দিয়ে দেশকে উদ্বুদ্ধ করেন।

ইন্দিরা গান্ধী (1966-77 এবং 1979-84):- ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৭১-এর যুদ্ধে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূমিকা, সিকিমের ভারত সংযুক্তিকরণ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিস্থাপনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়েছিল। আদর্শবাদী ভাবনা থেকে সরে এসে ইন্দিরা গান্ধী ভারত-সোভিয়েত বিশেষ কৌশলগত সম্পর্ক, সামরিক ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ এবং পোখরানে পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ভারতের বিদেশনীতিকে দৃঢ় বাস্তববাদের মাটিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। নেহরুর জোট-নিরপেক্ষ নীতি ইন্দিরা গান্ধী অনুসরণ করলেও বাস্তববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের বিদেশনীতিকে পরিচালনা করতে গিয়ে সোভিয়েত দেশের সঙ্গে সামরিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক জোরদার করেছিলেন। ৭০-৮০ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদেশনীতি বহুলাংশেই সোভিয়েতমুখী ছিল।

জোটরাজনীতির যুগে ভারতের বিদেশেনীতি:- 1967 সালে রাজ্যস্তরেও কংগ্রেসের জোট সরকার গড়ে উঠতে থাকে। 1978 সালে জানুয়ারি মাসে Indo-US Joint Commission গড়ে তোলা হয়।বাজপেয়ী বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও পরিবহন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। জনতা সরকারের পতনের পর মাত্র ছয় মাসের জন্য চরন সিং প্রধানমন্ত্রী হন। ওই সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকায়, চিন তিব্বত বিষয়ে রাজনারায়ণের উস্কানিমূলক বক্তব্য পিকিং এর কাছে ভুল বার্তা পাঠিয়েছিল। আবার পারমাণবিক প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিন ও পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল।

রাজীব গান্ধী (1984-89):- ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরে তিনি নির্বাচিত হয়ে আসেন। তিনি মার্কিন সফরে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেন। এবং সুপারকম্পিউটার CrayXMP-24 ক্রয় করার সম্মতি আদায় করেছিলেন USA থেকে। 1988 সালের সীমান্ত সমস্যা আলোচনায় চীন সফরে যান এবং JWG(Joint Working Group) তৈরি করেন। তাঁর সরকার শ্রীলঙ্কার তামিল গোষ্টি সমস্যায় হস্তক্ষেপ করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে।

৯০-এর দশকে জোট রাজনীতি ও ভারতের বিদেশে নীতি:- 1989 সালে National Front ক্ষমতায় আসে V.P. Singh প্রধানমন্ত্রী হন। বিদেশমন্ত্রী I.K.Gujral প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি কে জানাই

যে, ভারত দক্ষিণ এশিয়ার “বড়ভাই” সুলভ আচরণ করবে না। তবে এই সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যাকে সন্ত্রাসবাদীরা অপহরণ করলে কিছু সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

1990 সালে চন্দ্রশেখর ক্ষমতায় আসেন। ইরাকের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সমর্থন করে চন্দ্রশেখরের সরকার। তবে এই সরকার বারবার Pro USA Policy নেওয়ার কথা বলে।

1991 সালে প্রধানমন্ত্রী পদে পি. ভি. নরসিমা রাও মনোনিত হন।এই বছরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে পড়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে জোট রাজনীতি তথা ঠান্ডা লড়াই বিদায় নেয়।সোভিয়েত পতনের ফলে ভারতীয় বানিজ্যতে বিরাট ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। সেটি পূরণ করতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ‘পুবে তাকাও নীতি’ নেওয়া হয়েছিল। 1996 সালের নেপালের সাথে মহাকালী চুক্তি স্বাক্ষর হয়। 1997 সালের I.K. Gujral প্রধানমন্ত্রীর সময় USA কাশ্মীরের বিষয়ে মধ্যস্থতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

অটল বিহারী বাজপেয়ী -NDA জোট (1998-99 এবং 1999-2004):- দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে (1998 সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এর পর কেন্দ্রে যে NDA (National Democratic Alliance) জোট সরকার আসে BJP নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। (মাঝখানে 1996 সালে মাত্র 13 দিনের প্রধানমন্ত্রীত্ব বাদ দিয়ে) BJP নেতৃত্বাধীন জোট সরকার Extended Neighbourhood নীতি অব্যাহত রাখে। 1999 সালে IC-814 বিমান অপহরণের তীব্র নিন্দা জানাই। এই সরকার 1998 সালের 11 ও 13 মে পোখরানে পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে। এই সরকার বলে এ ধরনের অস্ত্রে “No First Use” নীতি অনুসরণ করবে।1999 সালে “লাহোর বাসযাত্রা”শুরু করেন পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে।

Operation Vijay -এর সরকারের এক অন্যতম সফল্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতিতে Vision Document খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে ‘গুজরাল ডকট্রিন এবং প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ির ‘সম্প্রসারিত প্রতিবেশী নীতি’র কথা বলেন।

মনমোহন সিং (UPA জোট)(মে 2004-2014):- ভারতের চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি।তবে্ বামদলগুলির সমর্থনে কংগ্রেস জোট United Progressive Alliance (UPA)কেন্দ্রে সরকার গঠন করে। এবং প্রধানমন্ত্রী হন মনমোহন সিং।তিনি একদিকে যেমন প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্কের উন্নয়নের জোর দেন তেমনি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও সুসম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন।2006 সালে নাথুলা পাস খুলে দেওয়া হয়। USA এর সাথে IAEA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 2010 সালে। 2013 সালের পুতিনের সঙ্গে আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া। হয় 2006 সালে জাপানের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হয়। মনমোহন সিং -এর বিদেশনীতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে অর্থনীতি।

নরেন্দ্র মোদী(2014- বর্তমান......):-

মনমোহন সিং-এর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদি ক্ষমতায় আসেন 2014 সালের 26 মে।এই ভারতের বিদেশনীতিতে বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটে। নরেন্দ্র মোদি সরকার বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশনীতিকে চারটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত করছে। এগুলি হল: (ক) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণের স্বাধীনতা বজায় রাখা; (খ) ভারতের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা; (গ) জাতিগঠন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে বিদেশনীতিকে পরিচালিত করা এবং (ঘ) বিশ্বের অগ্রগণ্য দেশগুলির সমান মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করা। পরাধীন ভারতে নেহরুর যে আদর্শবাদী চিন্তার উপর ভারতের বিদেশনীতি একদিন গড়ে উঠেছিল, আজ সেটা দৃঢ় বাস্তববাদী ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর আমলে ভারতের বিদেশনীতির পরিবর্তন ঘটে নির্জোট থেকে জোটমুখী হয়ে ওঠে। এই সময় বিদেশনীতিতে যে দিকগুলি বেশি গুরুত্ব পায় নরম শক্তি, মহান শক্তির ব্যবস্থাপনা, নির্জোট আন্দোলনের পুনর্বিবেচনা, Look West Policy, প্রতিবেশী সম্পর্কের পুনঃস্থাপন Look Act Policy প্রভৃতি।মোদী ক্ষমতায় আসার পরে 12th Indo-ASEAN সম্মেলনে মায়ানমারের Nay-Pi-taw তে পূর্বে তাকাও নীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে Act East Policy তে রূপান্তরিত করে ।এই আমলেই Surgical Strike চালানো বাধ্য হয়। এছাড়াও 2017 সালে India Afganisthan Air Corridor তৈরি করা হয়।2017 সালে ভারত QUAD(Quadrilateral Security Dialogue) অংশগ্রহন করে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অবস্থানকে আরো সুরক্ষিত এবং চীনের আগ্রাশনকে নিয়ন্ত্রন করতে QUAD অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করে 2021 সালে ভারত USAকে করোনার ঔষধ দিয়ে সহযোগিতা করেন। 2022 সালে ভারত ও আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 200 কোটি টাকা দেয়। 2022 সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারত নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছে।পাশাপাশি শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছে নয়া দিল্লী।

শান্তি, প্রগতি, নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখন্ডতা, ঔপনিবেশিকতা বিরোধিতা, বর্ণবিদ্বেষবাদ বিরোধী প্রভৃতি ভারতের বিদেশ নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলিতে আস্থাশীল থেকেও স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই 75 বছরে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা পরিবর্তনের চোরা স্রোত বয়ে গেছে। প্রাথম দিকে ভারতের বিদেশনীতির রূপকারগন একটা আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছিলেন। পরবর্তীকালে, বিশেষ করে চীন-ভারত যুদ্ধ (1962) এবং ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতের বিদেশনীতি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। 1990-এর দশকের শুরুতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ভারত সামরিকভাবে দিশাহীন হয়ে পড়ে।তদানীন্তন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ খুব সঠিকভাবেই অনুধাবন করেন, শুধু সামরিক শক্তিতে নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। অন্যথায় ভারতকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্রাত্যের অসম্মান নিয়েই চলতে হবে। তখন থেকেই শুরু হয় ভারতের বিদেশনীতির নতুন অভিমুখ- বিশ্বের অন্যতম বৃহৎশক্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার অভিমুখ।

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের হাত ধরে ভারত আজ চতুর্থ বৃহত্ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। ৮০-র দশকে ভারতের অর্থনীতি যেখানে ছিল ফ্রান্সের অর্থনীতির চারভাগের একভাগ, ভারত আজ অর্থনীতির মানদণ্ডে ফ্রান্সকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। উৎপাদিত শিল্পের নিরিখে ভারতের স্থান নবম, মেধার বিচারে তৃতীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমেত পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির কাছে ভারত আজ সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছে। জি-সেভেন থেকে শুরু করে পৃথিবীর সমস্ত বড় আর্থিক গোষ্ঠীগুলিতে ভারত আজ অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হওয়ার উল্লেখযোগ্য দাবিদার আজ ভারত। এশিয়ায় ভারতের অবস্থানটি চীনের প্রেক্ষিতেই বিচার করা হচ্ছে। ভারতের বিপুল বাজার পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনকারীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারত আজ স্বতন্ত্র মর্যাদা পাচ্ছে। প্রযুক্তিগত বিকাশে চন্দ্রযান-২-এর মতন অভিযান আন্তর্জাতিক মহলের কাছে ভারত সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছে।ভারতের বিপুল বাজার শুধু প্রতিবেশী দেশগুলির নয়, বিশ্বের সমস্ত প্রান্তে অবস্থিত দেশগুলি কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 2014 সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার গঠনের পর থেকে ভারত একটি বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার প্রবণতা ক্রমশ আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের দলীয় রাজনীতি বিবর্তন: একটি মূল্যায়ন

মৃণাল সিংহ বাবু , স্টেট এডেড কলেজ টিচার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

পটভূমি:- ভারত হল একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপন্ন রাষ্ট্র।আর উদার গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল রাজনৈতিক উদারতা ও সহনশীলতা। এই ধরনের প্রবণতার জন্যই জনগণ রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন ও সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। ভারতের এরকম পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে বহু রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে বহুদলীয় দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও রাজনীতির যথেষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের দলীয় রাজনীতির যাত্রা শুরু হয় ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভবকে কেন্দ্র করে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে জাতীয় কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল ছিলো না, স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল কান্ডারি ছিলো। তবে স্বাধীনতার পর জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই ভারতের দলীয় রাজনীতি শুরু হয় যা আজও স্বগতিতে চলমান। ভারতের দলীয় রাজনীতি বিষয়টি দীর্ঘ সময় ধরে অতিবাহিত হয়েছে। তাই বোধগম্যতার সুবিধার্থে বিষয়টিকে কয়েকটি দিক থেকে বর্ণনা করা হল—

প্রাধান্যকারী দলীয় রাজনীতি:- স্বাধীনোত্তরকালে সাংবিধানিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার যাত্রা শুরু করে,তার মুখ্য চালক হয়ে ওঠে রাজনৈতিক দলগুলো। দলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় দল ছিলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস,এই কংগ্রেস দলের প্রাধান্য বজায় ছিল ১৯৬৭ পর্যন্ত।এই সময়ে বিরোধী দলের মধ্যে অন্যতম ছিল কমিউনিস্ট পার্টি,প্রজা সোসালিষ্ট,জনসংঘ ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর দলীয় রাজনীতির বড় নেতা হিসেবে নেহরুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধিদীপ্ত নেহরুজি জাতি গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পিত অর্থনীতি,উন্নয়ণমূলক কর্মকান্ড,কৃষির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনকে সর্বভারতীয় ধাঁচে নির্মাণ করেন, আঞ্চলিক দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সরকার গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। এমতাবস্থায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং কংগ্রেসের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং কংগ্রেস হয়ে ওঠে “Umbrella Organization”। Morris Jones এই দলব্যবস্থাকে ‘One Dominant Party System’ বলেছেন। কংগ্রেস দলের একাধিপত্য বোঝাতে গিয়ে ‘Congress System’-এর উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি কংগ্রেস দলের ভূমিকাকে “Party of Consensus” এবং বিরোধী দলের ভূমিকাকে “Parties of Pressure” বলেছেন। কেনোনা

১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল যথাক্রমে ৩৬৪, ৩৭১ এবং ৩৬১টি আসন দখল করে এবং রাজ্যগুলোতেও প্রায় ৬১-৬৮ শতাংশ আসন লাভ করে।

বহুদলীয় ব্যবস্থায় সূচনা এবং দলীয় রাজনীতি:- ১৯৬৭-১৯৭৭-এর সময়কাল শুরু হয় ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি যুগান্তকারী রূপান্তর দিয়ে। বহুদলীয় ব্যবস্থার সূচনা এবং তার অন্যতম হল হিসেবে ৮টি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রাধান্য হ্রাস,যা ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস ২৮৩টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসে ইন্দিরা গান্ধীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতভেদ দেখা যায়,যা বৃদ্ধি পায় সমাজতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে। এর পরিনতি হিসেবে কংগ্রেস দলে ভাঙন দেখা যায় মূলত প্রবীন ও নবীন নেতাদের গোষ্ঠীতে। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দল ভেঙে Congress(O) Congress(R) গঠিত হয়, যার নেতা ছিলেন যথাক্রমে আর. কামরাজ এবং ইন্দিরা গান্ধী। কংগ্রেস দলের ভাঙনের পরেও ইন্দিরা গান্ধীর প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়,যার ফল হিসেবে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ৩৫২ আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু এই সময়বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু সহ অনেক রাজ্যে অকংগ্রেসি সরকার গড়ে ওঠে। কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী নেহেরু অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গোড়াপত্তনে সক্ষম হয়েছিলেন, যা অনেক কম প্রাতিষ্ঠানিক ছিলো।

১৯৬৯-১৯৭৬ সালের মধ্যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে দ্বন্দ্ব তীব্র হওয়ায় সভাপতি বারবার পরিবর্তন করা হয়– সি. শুভ্রামনিয়াম (১৯৬৯), জগজীবন রাম (১৯৬৯-১৯৭১), ডি. সঞ্জিভ্যা (১৯৭১-১৯৭২), ড. শঙ্কর দয়াল শর্মা (১৯৭২-১৯৭৪), ডি.কে. বড়ুয়া (১৯৭৪-১৯৭৬)। এই সময়ই জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে দুর্নীতি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলে জাতীয় পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায় এবং এই সময় দলত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন "জাতীয় জরুরি অবস্থা" জারি করা হয় এবং বিরোধী নেতৃবৃন্দদের কারারুদ্ধ করা হয়। এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ শ্লোগান দলীয় রাজনীতির মাত্রা বৃদ্ধি করে — "গরিবি হাঁটাও", "ইন্দিরা ইজ ইন্দিয়া"।

জোট সরকার ও দলীয় রাজনীতি:- ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা পার্টি গঠিত হয়।এই দলটি মূলত আইএনসি(ও), জনসংঘ, ভারতীয় ক্রান্তি দল, সোসালিষ্ট পার্টি নিয়ে গঠিত হয়। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় হয় এবং জনতা দলের নেতৃত্বে প্রথম অকংগ্রেসি জোট সরকার গঠিত হয়। এই জোট ২৯৫টি আসন লাভ করে।এই সরকারের

প্রধানমন্ত্রী হন মোরারজি দেশাই। জোটের শরিকদের মধ্যে অন্যতম ছিল কংগ্রেস(ও), ভারতীয় জন সংঘ, ভারতীয় লোক দল, সোসালিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি, চন্দ্র শেখর গোষ্ঠী ও অন্যান্য দল। এই সময় একটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, "এক শেরনি শ'লাঙ্গুর চিকমাগালুর চিকমাগালুর"। কংগ্রেসের পরাজয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাহস বৃদ্ধি করে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করে। কিন্তু এই জোট সরকার ১৯৭৯ সালেই ভেঙে পড়ে। ১৯৭৯ সালে জনতা পার্টি (এস)-এর নেতৃত্বে নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়, জোট সঙ্গী ছিলো কংগ্রেস(ও), কংগ্রেস(আই)। অবশ্য এর আগেই কংগ্রেস দল আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

কংগ্রেসের প্রাধান্য বৃদ্ধি এবং দলীয় রাজনীতি: ১৯৮০ সালে বাজপেয়ী ও আলবানির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হয়। ১৯৮০-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে পুনঃরায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। এই সময় কংগ্রেসের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিরোধী দলের অসংগঠিত রূপ ফিরে আসে। আবার এই সময় থেকেই দলীয় রাজনীতিতে ধর্ম, জাতপাত, সংরক্ষণ কেন্দ্রিক চিন্তাধারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা দলীয় ও ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এক দিকে কংগ্রেস দলে সহানুভূতির হাওয়া লাগে এবং কংগ্রেস দল ৪১৫ টি আসন লাভ করে এবং রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়।এই সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং ধর্ম ও জাতপাত কেন্দ্রীক দলগুলোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। শিবসেনা, অকালি দল, ডিএমকে, এআইডিএমকে প্রভৃতি দলগুলোর গুরুত্ব আঞ্চলিক দলীয় রাজনীতিতে বৃদ্ধি পায়, যা "দরকষাকষি"র রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ১৯৮৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে একটি শ্লোগান খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে - "গলি গলি মে শোর হ্যায় রাজীব গান্ধী চোর হ্যায়"। ১৯৯২ সালে একটি শ্লোগান দলীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রলেপ লাগিয়েছে– "এক ধাক্কা আওর দো বাবরি মসজিদ তোড় দো" ১৯৯৭ সালে পরপর দুটি সরকার গঠিত হয় যথাক্রমে দেভেগৌড়া ও গুজরালের নের্তৃত্বে।

জনতা সরকার ও দলীয় রাজনীতি:- ১৯৯৮ সালে বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয় যা ভারতীয় রাজনীতিতে পুনঃরায় জোট রাজনীতির চাকাকে গতি দেয়। এই সরকার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ১৯৯৯ সালে NDA(National Democratic Alliance) গঠিত হয় এবং বাজপেয়ীর নেতৃত্বে নতুন জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। জোট সঙ্গী ছিলো JD(U), TMC, BJD, DMK, AGP ইত্যাদি। জোট বলতে বোঝায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ১৯৯০ এর দশকে দলীয়

রাজনীতিতে 3M's – Mandol, Mandir, Market খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়। এই সময় নতুন একটি শ্লোগান তৈরি হয়- "বারি বারি সবকি বারি অব কি বারি অটলবিহারি"।

একদলীয় প্রাধান্যকারী জোট সরকার ও দলীয় রাজনীতি:- ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এনডিএ জোট পরাজিত হয় এবং UPA (United Progressive Alliance) ক্ষমতায় আসীন হয় এবং ২০০৯ সালেও এই জোট সরকার গঠন করে। ২০০৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্লোগান ওঠে - "কংগ্রেস কা হাত আম আদমি কা সাথ " এবং "ইন্ডিয়া শাইনিং"। এই শ্লোগান দুটি দলীয় রাজনীতিতে উত্তপ্ত করে তুলেছিলো। তবে এই সময় থেকেই দলীয় রাজনীতিতে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ইন্ডিয়া-মার্কিন 'অসামরিক পরমানু' চুক্তিকে কেন্দ্র করে জোট সরকার নরবরে হয়ে যায়। কেনোনা বাম দলগুলো সমর্মন তুলে নেয়। তবে অন্যান্য দল সমর্থন করায় সরকার স্থায়ী হয়। এরপর থেকে কমনওয়েলথ, কোলগেট,টু'জি প্রভৃতি দুর্নীতি সরকারের পশ্চাৎমুখী করে তোলে। ঠিক সেই সময় অন্না হাজারের নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু হয় এবং সেখান থেকেই আম আদমি পার্টির উদ্ভব ঘটে। এই আঞ্চলিক রাজনীতিতে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ৩৩৬টি আসন নিয়ে NDA সরকার গঠিত হয়। আগের সরকারের মতোই এই সরকারে একটি দলের প্রাধান্য দেখা যায় এবং শরিকদের আসনসংখ্যা কম থাকে। এই সময় আরেকটি নতুন শ্লোগান দলীয় রাজনীতিকে উজ্জিবিত করে তোলে – "আচ্ছে দিন আনেওয়ালা হ্যায়"। ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কর্মসংস্থান, মুদ্রাস্ফীতি, রাম মন্দির, দুর্নীতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রাজনীতির উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়।২০১৯ সালের নির্বাচনে ৩৩৩টি আসন নিয়ে NDA জোট সরকার গঠন করে। তবে বর্তমান সরকারের আমলেও দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বর্তমানে দলীয় আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সাংসদ, বিধায়ক কেনার মতো ঘটনা ঘটেছে। এমনকি রাজ্যগুলোতে বিরোধী সরকার ভেঙে সরকার গঠন করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতির জন্য সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যায়ন:- ভারতীয় রাজনীতিতে দলীয় ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক দলগুলোই জনমত, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রসার, জনগণের স্বার্থ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে দলীয় রাজনীতি যদি শুধু মাত্র "ভোট ব্যাঙ্ক" বা "সরকার গঠন"-এর জন্য হয়

তাহলে তা ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য খারাপ। ভারতীয় রাজনীতিতে পারিবারিক রাজনীতির, দুর্নীতির অনুপ্রবেশ,দলত্যাগ, মতাদর্শহীনতা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় দলীয় রাজনীতিও বিষময় হয়ে উঠেছে। এর মুক্তির পথ খুঁজে নিতে হবে । সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সততা এবং সতর্ক জনগণকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭৫ বছরে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান

সঞ্জু মন্ডল , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ , কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ঋক বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ধর্মচর্চা, চরিত্র গঠন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি ছিল ঐ যুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এযুগের মমতা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশাখা প্রমুখ বিদূষী নারীর কথা জানা গিয়েছিল। তবে মধ্যযুগে সমাজ বিভিন্ন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং নারীরা সেই সময় বিভিন্নভাবে শোষিত হতে থাকে এবং বঞ্চিত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অবক্ষয় শুরু হয়। সমাজে নারীরা ভোগ্য পণ্যে পরিণত হয়, সংসারের ঘেরা টোপের বাহিরে তাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হতো না, দেশ তথা সমাজের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হতো না অর্থাৎ বলতে গেলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারত না, ঘরের বাইরে গিয়ে কোন কর্মসংস্থানে কাজ করতে পারত না; তাদের কোন অধিকার ছিল না। আধুনিক যুগের শুরুর দিকেও নারীর সামাজিক অবস্থান বা রাজনৈতিক অবস্থানের চিত্রটা খুব একটা ভালো ছিল না। আধুনিক যুগেরও প্রারম্ভিক কালে নারীরা খুব উচ্চ বংশের না হলে লেখা পড়া বা কোন উচ্চপদস্থ কাজ করার সুযোগ পেত না। মধ্যযুগের অন্ধকার আচ্ছন্ন কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ সমাজের এক ভয়ঙ্কর এবং জঘন্য কুপ্রথা ছিল সতীদাহ প্রথা; সেই সময় নারীর রাজনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার তো দূরেই থাক নাবালিকা মেয়েদের বৃদ্ধ-কুলিন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হতো আবার কোন নারীর স্বামী যখন মারা যেতেন তখন স্বামীর সঙ্গে সেই নারী কেউ চিতায় পুড়িয়ে মারা হতো। সেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ভারতীয় নারীরা আজ শুধু ভারত নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতিভা ও দক্ষতা নিয়ে দেশকে অলংকৃত করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ক্ষেত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা সমস্ত ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ। যদিও ভারতে মহিলা

সাক্ষরতার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও তা এখনো পুরুষদের শিক্ষার হারের তুলনায় অনেকটাই কম। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও চিত্রটা ঠিক একই রকম। শহর অঞ্চলে নারী ও পুরুষের হার বর্তমানে সমান হলেও গ্রামাঞ্চলে এখনো মহিলা শিক্ষার হার কম। ১৯৯৭ সালের জাতীয় নমুনা জরিপের তথ্য অনুযায়ী কেবলমাত্র কেরালা ও মিজোরাম সার্বজনীন মহিলা সাক্ষরতা অর্জন করেছে। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেরালায় বাড়ির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির প্রধান কারণ হচ্ছে স্বাক্ষরতা। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সাক্ষরতার হার কম। সাক্ষরতার হার নারীদের ক্ষেত্রে ৬০.৬% এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এটি ৮১.৩% । ২০১১ সাল অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে স্বাক্ষরতা ৯.২% বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগের দশ বছরের বৃদ্ধির তুলনায় অনেকটাই কম। ভারতের সাক্ষরতার হারে ব্যাপক লিঙ্গ বৈষম্য আছে; ২০১১ সালে কার্যকরী স্বাক্ষরতার হার (৭ বছর বা তারও বেশি বয়সে) পুরুষদের জন্য ৮২.১৪% এবং মহিলাদের জন্য ৬৫.৪৬% ছিল (পরের বছর বা তারও বেশি বয়সী জনগণের থেকে পাওয়া ২০১৫ সালের তথ্য)। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকার নারীদের শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এছাড়া নারীদের সামাজিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যার ফলস্বরূপ সমাজের নারীদের উন্নতি ঘটছে এবং নারীরা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে এবং রাজনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করছে। অর্থাৎ বলা যায় বিগত কয়েক সহস্রাবদের ভারতীয় নারীদের অবস্থা বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে তাদের অবস্থান এর অবরোধে ঘটলেও স্বাধীনতার পর কিছুটা সরকারের সহায়তায় এবং নারীরা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে লড়াই করেছে তার ফলস্বরূপ নারীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে তথা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন উচ্চ পদ যেমন- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করছেন। ভারতে কাঠামো গত পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং রাজনীতিতে নারীদের অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নতি হচ্ছে।

৭৫ বছরে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান:

স্বাধীনতার পূর্বে নারীদের সামাজিক অবস্থান খারাপ ছিল, কিন্তু স্বাধীন ভারতের নারীদের অবস্থান এর কথা বললে অবশ্যই বলা যায় নারীদের উন্নতি হয়েছে। নারীদের ওপর শোষণ হ্রাস হয়েছে। কারণ তারা পুরুষদের সমান সম মর্যাদা ও অধিকার পেয়েছে। স্বাধীনতার পর সামাজিক ও

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেখানে নারীদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্য করা যায়। মহিলাদের সুরক্ষা বা নারীদের শোষণের থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কিছু আইন প্রণয়ন করেন; যেমন - বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন তৈরি হয় আবার হিন্দু নারীদের পুনঃ বিবাহের মতো আইন, নারীদের সম্পত্তির অধিকার আইন তৈরি হয়। সামাজিক স্তরে নারীদের শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তাই স্বাধীনতার পর নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রচার করা হয় এবং সরকার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে যার ফলে বিপুল সংখ্যক নারীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদেরও সংখ্যা বাড়ছে, ১৯৯১ সাল থেকে সশস্ত্র বাহিনীতে ৩টি Wings - এ নারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে। ভারতের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশের নারীদের ক্ষমতায় ন্যায্য অধিকার থাকা প্রয়োজন কারণ অনেকে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নারী হিসেবে বিবেচনা করে। তাই সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যাতে কোন নারী পুরুষের ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে; সমাজের অগ্রগতিতে নারীদের অবদান রাখতে এবং পুরুষের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন।

৭৫ এর ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান:

ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাধীনতার আগে কয়েক দশকে ভারতীয় নারীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর দু' দশকে ভারতীয় নারীরা বিভিন্ন কারণে রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু ১৯৭০ দশক থেকে পুনরায় ভারতের নারীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়। যেসব মহিলারা মন্ত্রী পরিষদের স্থান পেয়েছিল তারা স্বাস্থ্য, সমাজ, কল্যাণ ও দপ্তর গুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। ভারতের নারীর আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র ও স্বাদের ভূমিকা শুরু হয় ১৯৮০ দশক থেকে । এই পর্যায়ে নারীদের রাজনৈতিক তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজকর্ম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল সাধারণ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহন। ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভা নির্বাচনে সারাদেশের মহিলাদের প্রদত্ত ভোটের হার পুরুষদের তুলনায় ছিল অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, গ্রামাঞ্চলের মহিলা ভোটারদেরই সংখ্যা বেশি শহরাঞ্চলের মহিলাদের ভোটারদের তুলনায়। অন্য কথাই বলতে গেলে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের ভোট দেওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায়।

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাত্রা নির্ধারণ-এ অপর একটি উল্লেখযোগ্য সূচক হল আইন সবার মহিলা সদস্যদের সংখ্যা এবং ভূমিকা। সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে রাজনীতিতে মহিলাদের

অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি । বর্তমানে নারীরা রাজনৈতিক কার্যের সমান ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং এবং অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পদ অলংকৃত করেছেন। কিন্তু এখনও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়, মহিলারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নয় কারণ তারা এখনও প্রার্থী নয়, প্রতীক চিন্হ দেখে ভোট দেয়। এবং অনেক গ্রাম্য মহিলায় পরিবারে পুরুষ সদস্যরা যাকে ভোট দেয় তারাও সেই দলে ভোট দেয়। আবার কিছু কিছু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা যায়, কম শিক্ষিত এবং কম রাজনৈতিক সচেতন মহিলারা ভোটে জিতলেও সেই বিজয়ী মহিলা প্রতিনিধির থেকেও তার স্বামী বেশি প্রতিনিধিত্ব ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

যাইহোক এটা বলা যায় যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সমাজে নারীদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা কিছু অংশ সফল। ধীরে ধীরে নারীরা রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন অনুভব করছে এবং উন্নতি হচ্ছে। সময়ের সাথে নারীরা আরও বেশি স্বাধীন এবং সচেতন হচ্ছে।

ভারতীয় ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন এবং বাস্তবতা :-

অসম রেজা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সাম্মানিক ষষ্ঠ, সেমিস্টার, করিমপুর পান্নাদেবী কলেজ

ছাত্ররা পড়াশোনা করবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ গড়বে, রাজনৈতিক নেতারা রাজনীতি করবে - এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, ছাত্র রাজনীতি এই দুইয়ের মিশ্রণ, পড়াশোনার পাশাপাশি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। ভারতীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ কতটা যুক্তিযোগ্য, তা জানতে হলে ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

ছাত্র রাজনীতির বিবর্তন :- উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে western style এ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি শুরু হয়েছিল। এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ছাত্রদের অংশগ্রহণ সেই সময় থেকেই শুরু হয়। স্বদেশী আন্দোলনে (1905-08) বৃহৎ আকারে ছাত্রদের অংশগ্রহণ দেখা গিয়েছিল, যা ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একটি আন্দোলন হিসাবে শুরু হয়েছিল। অবশেষে, এই আন্দোলন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক উন্নয়ন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দেয়। কিছু তরুণ-তরুণী বিশ্বাস করেছিল যে সহিংস পদক্ষেপ ব্রিটিশদের দেশ

ছেড়ে চলে যেতে ভয় দেখাতে পারে। প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বোস, মদনলাল ধিংড়া এবং আরও অনেক ছাত্ররা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনও (1920-22) ছাত্রদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছিল। এতে সরকারি-অধিভুক্ত স্কুল ও কলেজ বয়কটকে 'অসহযোগের' পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভগৎ সিং লাহোরের ন্যাশনাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। রাজনীতিতে তার সম্পৃক্ততা অবশ্যই গভীরভাবে জড়িত ছিল। প্রকৃতপক্ষে, 1928 সালের জুন মাসে কীর্তি জার্নালে প্রকাশিত 'ছাত্র ও রাজনীতি' শিরোনামে একটি নিবন্ধে তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

1950 এর দশকের গোড়ার দিক ছিল উচ্ছ্বাসের সময়। কারণ নবজাতক জাতি তার দীর্ঘ-সহিষ্ণু জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভিন্ন বর্ণের রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি জাতিকে সুসংহত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবি দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি আন্দোলনের প্ররোচনা দেয়, যার সবকটিতেই ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছিল।এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য শিক্ষার্থীদের অব্যাহত সম্পৃক্ততার জন্য আরও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

1967 সালের মাঝামাঝি শুরু হওয়া নকশাল আন্দোলন প্রথমে উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন ছিল। কিন্তু এটি ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য অংশের কল্পনাকে ধরেছিল যারা স্কুল ও কলেজ থেকে ঝরে পড়ার পরে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণ 1970 এর দশকের শুরু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

1970-এর দশকের গোড়ার দিকে, ভারতীয় জাতির অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। 1971 সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ যুদ্ধে বিজয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব এবং কৃতিত্বের অনুভূতির উন্মেষ ঘটায়। কিন্তু এর পরের ঘটনাগুলো এই আশাকে অস্বীকার করে।

1974 সালের জানুয়ারিতে, গুজরাটে নবনির্মাণ আন্দোলন রাজ্য সরকারকে পতন করে। একটি স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে স্ফীত মেস বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে শুরু করে, এটি শীঘ্রই উচ্চ মূল্য এবং স্থানীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি বৃহত্তর প্রতিবাদে পরিণত হয়েছিল যা রাজনৈতিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের ফলে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হন।

গুজরাটের ঘটনাগুলি বিহারে অনুরূপ সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে যারা ছাত্র সংগ্রাম সমিতি গঠন করেছিল। সংগ্রাম বাড়তে থাকে এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ (জেপি), একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন রহস্যময় এবং ক্যারিশম্যাটিক রাজনৈতিক নেতা যিনি নির্বাচনী রাজনীতি এবং মন্ত্রী পদ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেছিলেন, তিনি এর নেতা হন। জেপি-র সম্পৃক্ততার সাথে, আন্দোলনটি জাতীয় রূপ নেয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যে অশান্তি হয়েছিল (যা 'সম্পূর্ণ ক্রান্তি' -সম্পূর্ণ বিপ্লবের ডাক দেয়) ইন্দিরা গান্ধীকে 1975 সালের জুনে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে প্ররোচিত করেছিল।

এর পরে যা ছিল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া স্থগিত করা এবং দমনমূলক কর্মের একটি সিরিজ যা ছাত্র সহ সমাজের সমস্ত অংশ দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল, কখনও কখনও করুণ পরিণতি সহ, যেমন পি রাজনের ক্ষেত্রে, কেরালার একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র যিনি শিকার হয়েছিলেন। 1976 সালের মার্চ মাসে পুলিশি বর্বরতা (মালয়ালম চলচ্চিত্র, পিরাভিতে নথিভুক্ত)। 1977 সালে ইন্দিরা গান্ধী সরকারের চূড়ান্ত পরাজয়, ছাত্রদের জড়িত থাকার কারণে কোন ছোট পরিমাপে ছিল না।

ছাত্রদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রতিক্রিয়া হিসেবে জেলে ঢোকানো, অত্যাচার এবং বারবার 'পড়াশোনায় মনোনিবেশ' করার পরামর্শ দেওয়া তখন থেকেই একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য। এটা প্রায় যেন সরকার ছাত্র শক্তিকে ভয় পায় এবং বিশ্বাস করে যে এই জিনিটিকে বোতলে রাখা, প্রয়োজনে উচ্চ-হস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে, তাদের ধারাবাহিকতার নিশ্চিত গ্যারান্টি।

কিন্তু জরুরি অবস্থার পর থেকে গত সাড়ে চার দশকে ছাত্রদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরিবেশগত এবং মানবাধিকার আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সাথে, যদি কিছু হয়, ছাত্র রাজনীতি সামাজিক ভণ্ডামি ও উদাসীনতাকে রোখার জন্য আরও বেশি আউটলেট খুঁজে পেয়েছে এবং একটি কোর্স সংশোধনের দাবি করেছে। মানবিক অবস্থার পুনর্মূল্যায়নের দাবির সাথে রাজনৈতিক দাবি ছাত্রদের সক্রিয়তার আদর্শ হয়ে উঠেছে।

ছাত্র রাজনৈতিক সক্রিয়তা একটি উন্নত বিশ্বের জন্য সংগ্রামে যোগদানের জন্য আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে, 2019 সালের শেষের দিকে CAA-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং পুলিশি দমন-পীড়ন দেখা গেছে, যা আগের সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

কুইজ

সৌরভ স্বর্ণকার, পঞ্চম সেমিস্টার রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১) নিম্ন লিখিত কোন রাজ্যে বিধানপরিষদ নেই?-
ক) রাজস্থান খ)মহারাষ্ট্র গ) বিহার।

২) কে সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধীকে জাতির পিতা বলেছেন?-
ক) নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু খ)বঙ্কিমচন্দ্র
গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩) ভারত কবে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়?-
ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৪৭ গ) ১৯৫১।

৪) "ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স" কার রচনা-
ক) অ্যারিস্টটল খ) জেমস মিল
গ) জে.কে.হলস্টি।

৫)২০০৭ সালে "সার্ক" এর সদস্য পদ লাভ করে-
ক) আফগানিস্তান খ) নেপাল গ) চীন।

৬) "ঠান্ডা লড়াই" কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করে?-
ক) ফ্রিডম্যান খ) বার্নার্ড বারুচ
গ) জে কে হলস্টি।

৭) NATO জোটের পাল্টা জোটের নাম কি?-
ক) WARSAW খ) COMECON
গ) MEDO।

৮) দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সমাধির নাম কি?-
ক) শহীদ মিনার খ) রাজঘাট গ) খুসবু।

৯) "বিশ্ব মানবাধিকার দিবস" পালিত হয় প্রতিবছর?-
ক) ১০ জানুয়ারি খ) ১০ মার্চ গ) ১০ ডিসেম্বর।

১০) বিশ্বের বৃহত্তম বিতর্ক সভা হলো?-
ক) জাতিসংঘ গ) নিরাপত্তা পরিষদ
ঘ) সাধারণ সভা।

১১) মার্কিন রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ হলো?-
ক) ৪ বছর খ) ৫ বছর গ) ৬ বছর।

১২) লৌহ যবনিকা তত্ত্বটি কে উপস্থাপন করেন?-
ক) মার্শাল খ) চার্চিল গ) ট্রুম্যান।

১৩) সিমলা চুক্তি কবে হয়েছিল?-
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭০ গ) ১৯৭৫।

১৪) "The End Of History And The Last Man" কার লেখা?-
ক) ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা খ) জোসেফ ফ্রাঙ্কেল
গ) নরসিমা রাও।

১৫) কবে মুম্বাই য়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়?-
ক) ২০০০ খ) ২০০৮ গ) ২০০৫।

১৬) "Politics Among Nations " গ্রন্থটির রচয়িতা?-
ক) মরগেনথাউ খ)হলস্টি গ)ফ্রাঙ্কেল।

১৭) ভারতের 'No First Strike' এই পরমাণু নীতির প্রধান রূপকার কোন প্রধানমন্ত্রী?-
ক) অটল বিহারী বাজপেয়ি খ)রাজীব গান্ধী
গ) নরেন্দ্র মোদি।

১৮) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়?-
ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৫ গ) ১৯৮৪।

১৯) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কটি অঙ্গ আছে?-
ক) ৬ খ) ৫ গ) ৪

২০) চীনের আইনসভা কে বলা হয়?-
ক) জাতীয় গণ কংগ্রেস খ) কাউন্সিল গ) সিনেট।

বিভাগের অন্দরমহল

1st Semester Result 2021-2022

SL . NO.	Reg. NO.	Name	SGPA Grade	Marks (%)
1	021768	RUBINA KHATUN	8.10%	76.72
2	021780	ANUPAM SAHA	8.10%	76.72
3	021796	SUJOY MONDAL	7.70%	72
4	021791	SAHEL SHAH	7.30%	68
5	021781	APURBA HALDAR	7.90%	71.27
6	021792	SAID ANUWAR SHAH	7.30%	68
7	021762	PREYASE BHATTACHARJEE	7.40%	68.72
8	021757	DARSANA MONDAL	7.30%	67.63
9	021774	SUSMITA MONDAL	7.40%	70.54
10	021765	RIMI BISWAS	7.30%	67.63
11	021770	SAMIYA KHATUN	7.30%	69.09
12	021759	JAHERA KHATUN	7.30%	67.27
13	021771	SHAHANAJ PARVIN	7.10%	68
14	021786	MD BIN SAYED	7.10%	67
15	021789	NILAY SARKAR	7.50%	70.54
16	021769	SAHANAJ PARVIN	7.40%	69.09
17	021784	KAMRUJJAMAN BISWAS	7.00%	68
18	021787	MEHABUR HOSSEION MONDAL	7.30%	66.9

3rd Semester Result 2021-2022

Sl no:-	Reg. No:-	Name:-	1st semester	2nd semester	3rd semester
1	019837	SOHELI PRAMANICK	65.81%	73.81%	74.85%
2	019836	SHRABONI DAS	74.54	77.45	76.28
3	019831	NASRIN KHATUN	69.81	73.45	74.28
4	019848	SOURABH SWARNAKAR	76.36	78.18	78.
5	019833	RAHIMA KHATUN	66.54	71.27	72.00
6	019832	PALLABI SARKAR	67.27	72.00	68.85
7	019839	SUSMITA MONDAL	72.36%	74.90%	70.57%
8	019845	RAJAT GHOSH	57%09	68.00	65.42
9	019846	RINTU BISWAS	65.45%	72%	70.85%
10	019834	RIMPA SARKAR	68%	71.27%	69.42%
11	019827	ANANYA PAUL	77.45%	80.36	77.71
12	019841	ASIK MASUD MANDAL			72 85%
13	019847	SHUBHA DAS BAIRAGYA	62.18%	68%	64.57%

6th Semester/Final year Result(2021-22 session) Political Science (Honours)

No.	Reg. no-	Name	% of Number	CGPA
1	018530	BARSHA KHATUN	79.73 %	8.56
2	018542	ASOM REJA	78.27 %	8.34
3	018559	SUVOMOY MONDAL	75.14 %	8.06
4	018529	ASMINA KHATUN	74.43 %	7.93
5	018545	INJABUL HOQUE	73.95 %	7.97
6	018533	LABONI HALDER	73.89 %	7.93
7	018537	RUMANA SULTANA	72.49 %	7.90
8	018531	FIROJA KHATUN	72.38 %	7.77
9	018546	MANIRUL SARDAR	71.78 %	7.70
10	018536	RICHA SHARMA	71.51 %	7.63
11	018543	BAPAN SHAH	71.24 %	7.70
12	018556	SOUVIK GHOSH	70.65 %	7.59
13	018535	MILINA KHATUN	70.38 %	7.67
14	018550	RAJESH SHAIKH	70.16 %	7.41
15	018544	BITTU GHOSH	70.05 %	7.43
16	018541	APURBA DAS	69.19 %	7.43
17	018549	PRITAM MONDAL	68.97 %	7.34
18	018548	PREMOMOY SHARMA	68.76 %	7.36
19	018557	SUJAN SHAIKH	68.70 %	7.40
20	018540	SUSMITA ROY	68.54 %	7.26
21	018553	SAHIDUL ISLAM SARDAR	68.22 %	7.31
22	018539	SUNIDHI SARKAR	62.49 %	6.70

পুস্তক পর্যালোচনা

স্বাধীনতা আন্দোলন ও স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ: আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা সম্ভাবনা

সম্পাদক- আশিস নিয়োগী

প্রকাশক- জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
বেলভেডিয়র, কলকাতা ৭০০ ০২৭
প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
মূল্য : ১৫০ টাকা

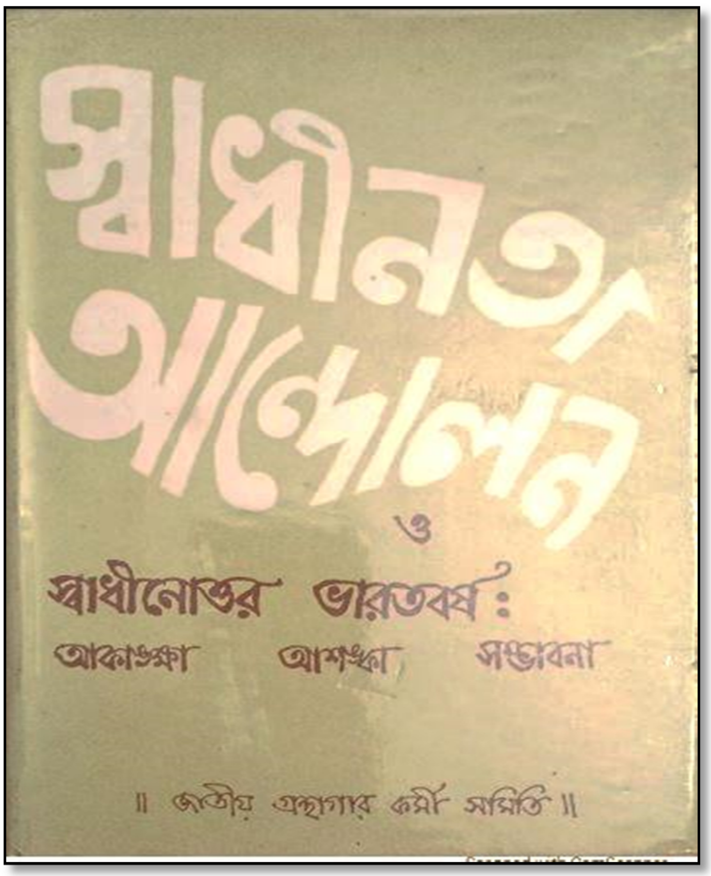

বইয়ের নামকরণ থেকেই বইয়ের বিষয়বস্তু স্পষ্ট। একটি অনবদ্য দলিল সময়ের নিরিখে অত্যন্ত যত্ন সহকারে রচিত হয়েছে। সমকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত পন্ডিত বর্গদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই বইটি। বিনয় চৌধুরী থেকে নরহরি কবিরাজ, কমল কুমার বসু থেকে যশোধরা বাগচী সকলেই সমকালীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতার পরে আশঙ্কা এবং তা থেকে উদ্ধারের বিকল্প পথের কথা বলেছেন। সর্বোপরি কিভাবে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আদর্শ, আত্মত্যাগ কিভাবে দ্রুততার সঙ্গে অবলুপ্ত হলো, যে প্রতিশ্রুতি স্বাধীনতার শুরুতে দেওয়া হয়েছিল তা কিভাবে উড়ে গেল বা বিপথগামী হলো তারও ব্যাখ্যা বিভিন্ন প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে। সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা, 'মূল্যবোধ স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে' একটি অপূর্ব নিবন্ধ। বলতে গেলে পুরো বইটি এক নিশ্বাসে সম্পন্ন করবার মতো। ইতিহাসের পাশাপাশি ৫০ বছর স্বাধীনতার উদযাপনের প্রাসঙ্গিকতা কেও আলোচনায় নিয়ে এসেছে। শুধু অজানাকে জানা নয় সমাজ সংস্কৃতি বিবর্তন এবং প্রেক্ষিতকে বিশ্লেষণের জন্য এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের কাছে এই বইটি বিকল্পহীন।

কুইজের উত্তর

১. (ক), ২. (ক), ৩. (ক), ৪. (গ), ৫. (ক), ৬. (খ), ৭. (ক), ৮. (খ), ৯. (গ), ১০. (ঘ), ১১. (ক), ১২. (খ), ১৩. (ক), ১৪. (ক), ১৫. (খ), ১৬. (ক), ১৭. (ক), ১৮. (খ), ১৯. (ক), ২০. (ক)

সুজাতা মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, সাম্মানিক, করিমপুর পান্না দেবী কলেজ

গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

realme
Shot by Breand Bapan
2022/06/30 14:41

Anandapally, Ramkrishnapally, Karimpur, West Bengal 741152, India
Karimpur
West Bengal
India
2022-06-30(Thu) 01:37(PM)
31°C
88°F
Anandapally
আনন্দপল্লী
Google

বিদায় সম্বর্ধনা

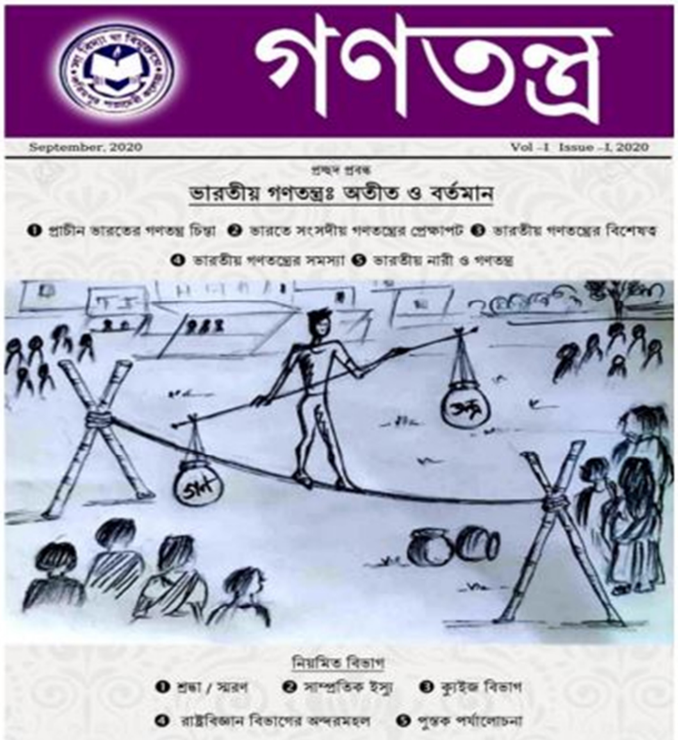

গণতন্ত্র
September, 2020
Vol -I Issue -I, 2020
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
ভারতীয় গণতন্ত্রঃ অতীত ও বর্তমান
❶ প্রাচীন ভারতের গণতন্ত্র চিন্তা ❷ ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট ❸ ভারতীয় গণতন্ত্রের বিশেষত্ব
❹ ভারতীয় গণতন্ত্রের সমস্যা ❺ ভারতীয় নারী ও গণতন্ত্র
নিয়মিত বিভাগ
❶ শ্রদ্ধা / স্মরণ ❷ সাম্প্রতিক ইস্যু ❸ ক্যুইজ বিভাগ
❹ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অন্দরমহল ❺ পুস্তক পর্যালোচনা

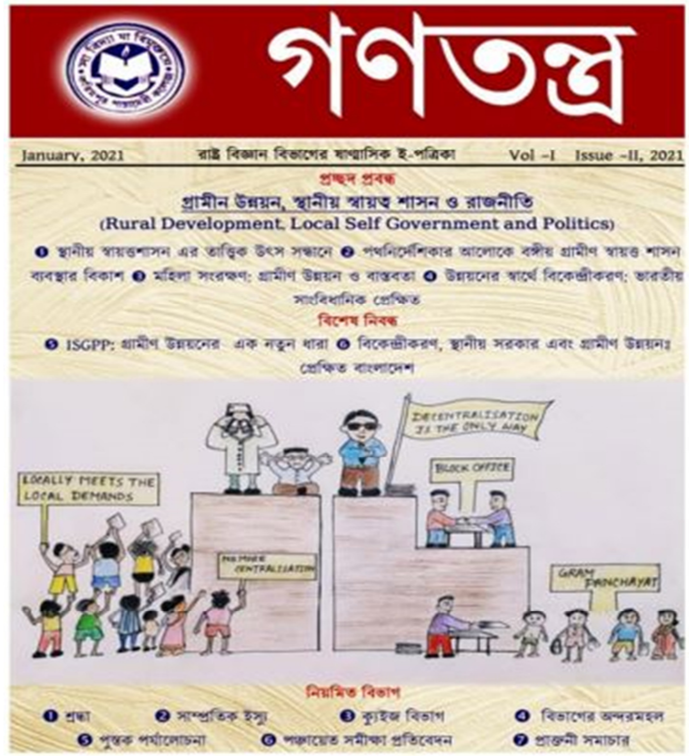

গণতন্ত্র
January, 2021
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা
Vol -I Issue -II, 2021
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
গ্রামীন উন্নয়ন, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ও রাজনীতি
(Rural Development, Local Self Government and Politics)
❶ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এর তাত্ত্বিক উৎস সন্ধানে ❷ পথনির্দেশিকার আলোকে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ❸ মহিলা সংরক্ষণ: গ্রামীণ উন্নয়ন ও বাস্তবতা ❹ উন্নয়নের স্বার্থে বিকেন্দ্রীকরণ: ভারতীয় সাংবিধানিক প্রেক্ষিত
বিশেষ নিবন্ধ
❺ ISGPP: গ্রামীণ উন্নয়নের এক নতুন ধারা ❻ বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার এবং গ্রামীণ উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
DECENTRALISATION IS THE ONLY WAY
LOCALLY MEETS THE LOCAL DEMANDS
BLOCK OFFICE
GRAM PANCHAYAT
নিয়মিত বিভাগ
❶ শ্রদ্ধা ❷ সাম্প্রতিক ইস্যু ❸ ক্যুইজ বিভাগ ❹ বিভাগের অন্দরমহল
❺ পুস্তক পর্যালোচনা ❻ পঞ্চায়েত সমীক্ষা প্রতিবেদন ❼ প্রাক্তনী সমাচার

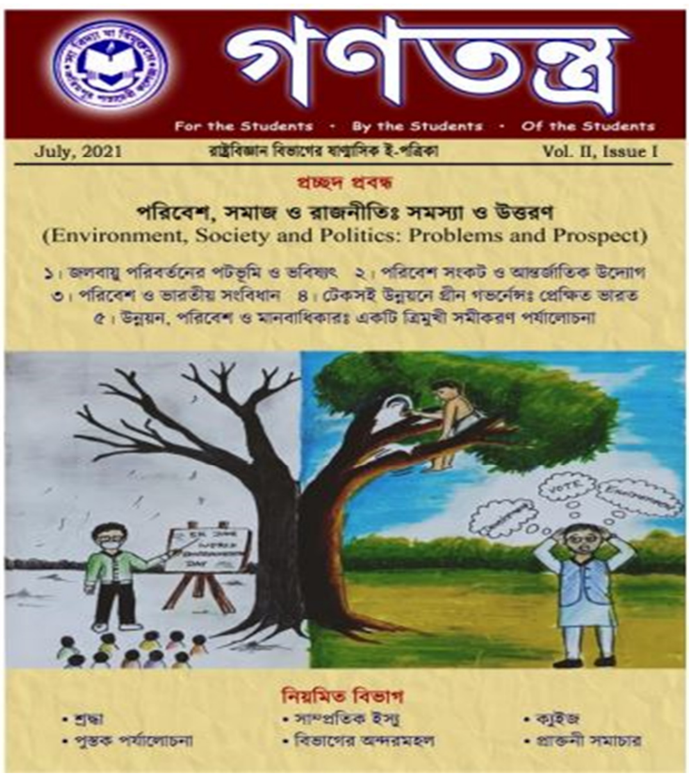

গণতন্ত্র
For the Students · By the Students · Of the Students
July, 2021
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা
Vol. II, Issue I
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
পরিবেশ, সমাজ ও রাজনীতিঃ সমস্যা ও উত্তরণ
(Environment, Society and Politics: Problems and Prospect)
১। জলবায়ু পরিবর্তনের পটভূমি ও ভবিষ্যৎ ২। পরিবেশ সংকট ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ
৩। পরিবেশ ও ভারতীয় সংবিধান ৪। টেকসই উন্নয়নে গ্রীন গভর্নেন্সঃ প্রেক্ষিত ভারত
৫। উন্নয়ন, পরিবেশ ও মানবাধিকারঃ একটি ত্রিমুখী সমীক্ষণ পর্যালোচনা
নিয়মিত বিভাগ
• শ্রদ্ধা • সাম্প্রতিক ইস্যু • ক্যুইজ
• পুস্তক পর্যালোচনা • বিভাগের অন্দরমহল • প্রাক্তনী সমাচার

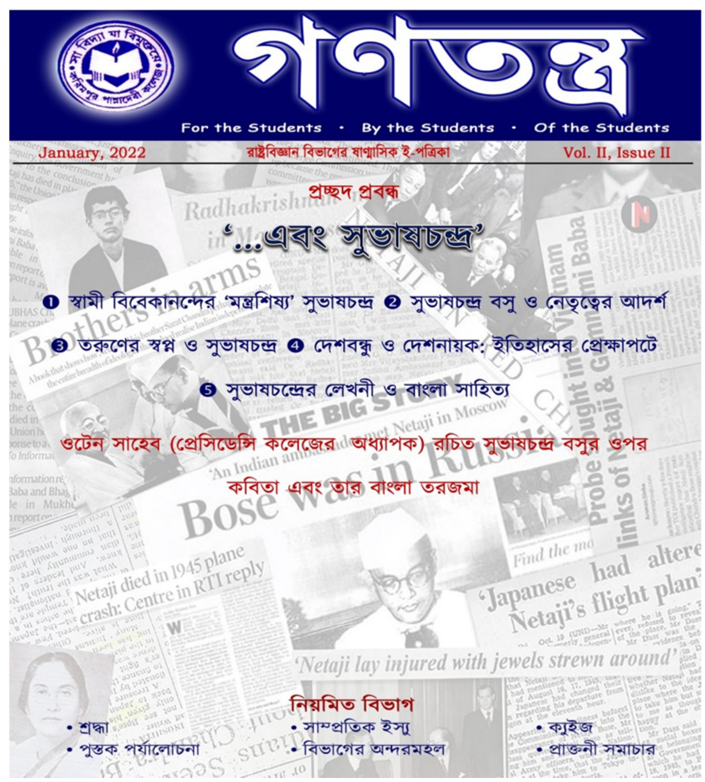

গণতন্ত্র
For the Students · By the Students · Of the Students
January, 2022
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ষাণ্মাসিক ই-পত্রিকা
Vol. II, Issue II
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
'...এবং সুভাষচন্দ্র'
❶ স্বামী বিবেকানন্দের 'মন্ত্রশিষ্য' সুভাষচন্দ্র ❷ সুভাষচন্দ্র বসু ও নেতৃত্বের আদর্শ
❸ তরুণের স্বপ্ন ও সুভাষচন্দ্র ❹ দেশবন্ধু ও দেশনায়ক: ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে
❺ সুভাষচন্দ্রের লেখনী ও বাংলা সাহিত্য
ওটেন সাহেব (প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক) রচিত সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর
কবিতা এবং তার বাংলা তরজমা
Bose was in Russia
Netaji died in 1945 plane crash: Centre in RTI reply
'Japanese had altered Netaji's flight plan'
'Netaji lay injured with jewels strewn around'
নিয়মিত বিভাগ
• শ্রদ্ধা • সাম্প্রতিক ইস্যু • ক্যুইজ
• পুস্তক পর্যালোচনা • বিভাগের অন্দরমহল • প্রাক্তনী সমাচার

প্রচ্ছদ - ফিরে দেখা